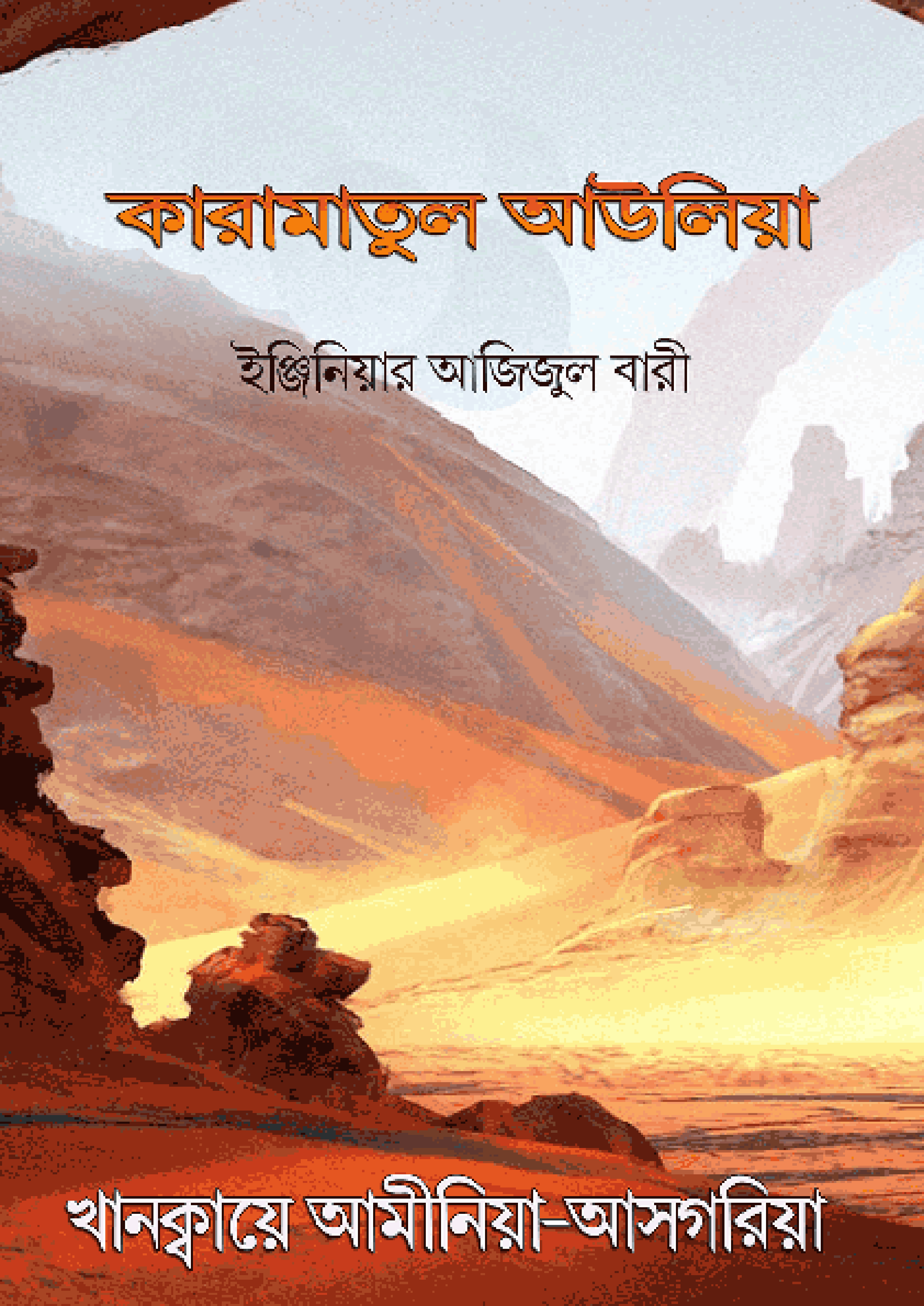


কারামাতুল আউলিয়া

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

কারামাতুল আউলিয়া

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি

প্রকাশ: ০২/০৯/২১

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

প্রাক কথন

আলহামদুলিল্লাহ! খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ থেকে 'কারামাতুল আউলিয়া' শিরোনামের এই গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে লেখক ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী ওলিআল্লাহদের কর্তৃক প্রকাশিক কারামতের বর্ণনা এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

ওলিদের মাধ্যমে অতিস্বাভাবিক ঘটনা বা কারামত প্রকাশ হওয়ার ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। ওলিদের কর্তৃক কারামত প্রকাশের ওপর বিশ্বাস রাখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বিদাভুক্ত বিষয়। সুতরাং কারামত প্রকাশ হওয়ার সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এ গ্রন্থ পাঠ করে বিভিন্নভাবে সকলে উপকৃত হবেন এটাই আশা। খাস করে সুলুকের রাস্তায় কেউ কেউ পাড়ি জমাতেও আগ্রহশীল হবেন- এটাও আমরা আশা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহায্য করুন। আমীন।

ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।
০২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আউলিয়া

আরবি 'ولي' শব্দের অর্থ 'সমর্থক', 'অভিভাবক' বা 'রক্ষক'। এ শব্দের বহুবচন হচ্ছে 'أولياء'। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন রূপে শব্দটি ২০০ বারের বেশি উপস্থাপিত হয়েছে। একটি উদাহণ হচ্ছে এই:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

-"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মু'মিনবৃন্দ- যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।" (সূরা মাইদা (৫): ৫৫)

কে ওয়ালি

শব্দটির আরেক অর্থ হচ্ছে 'বন্ধু' বা 'মিত্র'। উপরের আয়াতে বন্ধু হিসেবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। একজন আল্লাহর বন্ধুকে বলা হবে: ولي الله (ওয়ালিআল্লাহ)।

শরীয়তে ওয়ালির সংজ্ঞা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ * لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ * ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

-"মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং সর্বদা (আল্লাহকে) ভয় করে। তাদের

জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা।” (সূরা ইউনুস (১০): ৬২-৬৪)

উক্ত আয়াতমালা থেকে একজন ওয়ালির দু’টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে:

১. তিনি হবেন পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার।

২. তিনি হবেন পূর্ণাঙ্গ তাক্বওয়ার (আল্লাহভীতির) অধিকারী।

ওয়ালি হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছেন। তাঁর মাক্বাম বা স্তর হচ্ছে এমন, এক মুহূর্তও তিনি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিতি থেকে গাফিল নন। আল্লাহ তাঁকে নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কোনো বড়ো পাপ (গুনাহে কবিরা) যাতে হয় না সে নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহই তাঁর ওয়ালিকে দিয়ে থাকেন। আর ছোট পাপ (গুনাহে সগিরা) যদি হয়েই যায়- আল্লাহর ওয়ালি সাথে সাথে তাওবাহ করে নেন। এককথায়, আল্লাহর ওয়ালি বে-গুনাহ নন। তবে পাপের কাজ যাতে হয়না সে ব্যাপারে সর্বদাই সজাগ থাকেন।

পবিত্র হাদিসে আউলিয়া প্রসঙ্গ

ওয়ালি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দু’একটা আয়াত আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। আল্লাহর ওয়ালি সম্পর্কে হাদিস শরিফেও বেশ কিছু বর্ণনা বিদ্যমান। এর একটির উদ্ধৃতি তুলে ধরছি:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا،

وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ - رواه البخاري

“হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘আমি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি যে আমার বন্ধুদের সঙ্গে শত্রুতা করবে। আমার বান্দাহ যে সবার্ধিক মুহাব্বতের বিষয় নিয়ে আমার কাছে আসে, তাহলো যাকিছু আমল তাকে করতে বলেছি তা সে করে। আমার বান্দাহ এভাবে আমার কাছে থেকে কাছে আসে নফল ইবাদতের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ভলোবাসি। তখন আমি হয়ে যাই তার কান যা দিয়ে সে শুনে, হয়ে যাই তার চোখ যা দিয়ে সে দেখে, আমি হয়ে যাই তার হাত যা দিয়ে সে কিছু ধরে এবং হয়ে যাই তার পা যা দিয়ে সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কোনো কিছুর আবদার জানায়, আমি তা কবুল করি, সে যদি আমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা চায় আমি তা কবুল করি। আমি কোনো কিছুর ব্যাপারেই ইতস্তত করি না যেমনি ঈমানদারের আত্মাকে নিয়ে যেতে করি, কারণ সে মৃত্যুকে ঘৃণা করে, সুতরাং আমি তাকে নিরাশ করতে ঘৃণা করি।” (সহিহ বুখারি: ৬৫০২)

এ বিখ্যাত হাদিসে কুদসী থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ তা’আলার অভিপ্রায় এটাই যে, আমরা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দায় পরিণত হই। তাঁর বন্ধুদের দলে মিলিত হই। এই হাদিস দ্বারা আল্লাহর একান্ত নৈকট্যশীল বান্দাহ তথা আউলিয়ায়ে কিরামের স্বরূপও ফুটে ওঠেছে। সুতরাং এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। এই হাদিসে কুদসী থেকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো হক্ব হিসেবে উঠে এসেছে:

১. আউলিয়াদের বিরোধিতা করা গুনাহে কবিরার অন্তর্ভুক্ত।

২. আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আউলিয়ায়ে কিরাম আছেন, তার সত্যতা নিশ্চিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

৩. এটা নিশ্চিত হলো যে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরে ভালোবাসেন। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

৪. নফল আমল বান্দাহকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে।

৫. আল্লাহ্ যখন কাউকে ভালোবেসে ফেলেন, তখন এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে তিনি দান করেন আধ্যাত্মিক ও শারীরিক শক্তি।

৬. আল্লাহ্ যাকে ভালোবেসেছেন তার যে কোনো বৈধ আবদার কবুল হয়।

৭. কারামত যে বাস্তব এবং আল্লাহর নৈকট্যশীল ব্যক্তিরাই আল্লাহর হুকুমে তা আঞ্জাম দিতে সক্ষম।

৮. আল্লাহর যে কোনো মু'মিন বান্দাহ ওয়ালির স্তরে উন্নীত হতে পারেন যদি আল্লাহ্ চান।

আউলিয়ায়ে কিরামের স্তর

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে স্তর বিন্যস্ত করেছেন। এরা সত্যিই আল্লাহর একান্ত বন্ধুজন। তাঁদেরকে তিনি দান করেছেন বিভিন্ন উপহার ও কর্মক্ষমতা যা সাধারণ ঈমানদারদের দেওয়া হয় নি। এ কারণেই সাধারণ্যের অনেকেই তাঁদের কার্যকলাপের হাক্বিক্বাত বুঝতে অক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে নিজের গুণাবলীর রহস্য উন্মোচন করেছেন। আমরা এবার আউলিয়য়ে কিরামের স্তরগুলো বর্ণনা করবো। সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে এই:

*** গউস (সাহায্যকারী)**

*** কুতুব (খুঁটি)**

*** নুক্বাবা বা নুজাবা (সর্দার)**

*** আওতাদ বা আক্বতাব (পেরেক)**

*** আবরার (সাধু)**

*** আবদাল (স্থলবর্তী)**

*** আখইয়ার (পছন্দকৃত)**

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ফাতওয়ার সংকলনে একটি প্রবন্ধে কুতুব, আওতাদ, নুজাবা ও আবদাল সম্পর্কে লিখেছেন:

"আমার নিকট বর্ণনা পৌঁছুয়েছে যে, অজ্ঞ কেউ কেউ আউলিয়ায়ে কিরামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। আউলিয়াদের মধ্যে আছেন আবদাল, নুক্বাবা, নুজাবা, আওতাদ এবং আক্বতাব। এ ব্যাপারে অনেক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান। এসব হাদিস দ্বারা এদের অস্তিত্ব প্রমাণিত। সুতরাং এসব হাদিস আমার বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। এতে সবাই উপকৃত হবেন- আশারাখি। জেনে রাখা ভালো, কট্টর অজ্ঞদের অস্বীকৃতিকে কোনো মূল্য ও গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। সুতরাং আমি বলি, এসব হাদিস আসহাবে কিরাম থেকে সুস্পষ্টভাবে (সহিহশুদ্ধভাবে) বর্ণিত হয়েছে। ..." এরপর তিনি ১৮ জন সাহাবা ও তাবিঈর নাম লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

হাদিস থেকে প্রমাণ

আমরা বেশ ক'টি হাদিস লিপিবদ্ধ করছি। আশাকরি এগুলো পাঠের পর আউলিয়াদের অস্তিত্ব ও স্তর সম্পর্কে কারোর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকবে না।

হাদিস ১

হযরত উম্মে সালামাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একজন খলিফার মৃত্যুর পর মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। মদিনায় বসবাসকারী এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি মক্কা শরীফ যাবে। মক্কার কিছু লোক রুকন ও মাক্বাম (রুকনে হাজারে আওয়াদ ও মাক্বামে ইব্রাহিম এর মধ্যবর্তী স্থানে) তাঁর নিকট এসে [খলিফা হিসেবে] আনুগত্যের কসম করবে। সিরিয়া থেকে একটি সামরিক অভিযান তার বিরুদ্ধে প্রেরিত হবে। মানুষ সৈন্যদের দেখে, সিরিয়ার আবদাল এবং ইরাকের উত্তম মানুষ খলিফার হাতে বাইআত গ্রহণ করবে।[২]

---

[১] হাউইল ফাতাওই ২: ২৪১; আজলুনি- কাশফ পৃ. ৩৫; শাখওই- মাক্বাদিস পৃ. ৮।

[২] আবু দাউদ হা.ন. ৩৭৩৭; আহমদ ৬:৩১৬; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ৮:৬০৯; আবদুর রাজ্জাক ১১:৩৭১; তাবারানি ৩:৩৫ ইত্যাদি। একটি দীর্ঘ হাদিসের অংশ।

হাদিস ২

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে যারা আবদাল তারা নিজেদের আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না- বরং আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে জান্নাতবাসী হবে। তাদের আত্মার উদারতা সর্বোচ্চ পর্যায়ের, তাদের মধ্যে কারোর প্রতি ঘৃণা বা অভিযোগ নেই এবং হৃদয় সর্বদা সবার প্রতি শান্তিময় থাকে। সমগ্র মুসলমানদের প্রতি তাদের দয়া ও অনুগ্রহ বিদ্যমান।"[৩]

হাদিস ৩

হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আবদালের মর্যাদা অপরদের তুলনায় উত্তম শুধু নফল রোযা, নামায ও তাসবীহ জপার দ্বারা হয় নি- বরং তাদের মধ্যে আছে উত্তম চরিত্র, নৈতিক গুণাবলী, সঠিক নিয়াত, হৃদয় অপর সব মুসলিমদের সাথে প্রশান্ত এবং সবাইকে আল্লাহর ওয়াস্তে উপদেশ দান করার অভ্যেস।"[৪]

হাদিস ৪

হযরত আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "নবুয়াত শেষ হয়ে যাওয়ার পর যারা পৃথিবীর আওতাদ ছিলেন, আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদের মধ্য থেকে ৪০ জন বেছে নিলেন- তারা সবাই ছিলেন আবদাল। কেউ একজন মারা গেলে আল্লাহ সাথে সাথে আরেকজন দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করেন। এদের মধ্যে ৩০ জনের ইয়াক্বিন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের মতো। তাঁরা

---

[৩] শুয়াবুল ঈমান- বাইহাকি, ৭:৪৩৯; কিতাবুল আউলিয়া- ইবনে আবিদ-দুনইয়া পৃ. ২৮ ও ৫৮; হাকিম - নাওয়াদিরুল উসূল, # ৫১। হাদিসটি জঈফ।

[৪] নাওয়াদিরুল উসূল - হাকিম তিরমিযি, # ৫১; ফিরদাউস - ইমাম দায়লামী ২:৩৪৪; ইবনে আসাকির হযরত আনাস রা. থেকে ১:২৯২; কারামাতুল আউলিয়া- ইবনে আবিদ দুনইয়া হযরত আলী রা. থেকে # ৫৭।

সফলতা পাননি শুধুমাত্র বেশি নফল ইবাদত দ্বারা- বরং চারিত্রিক গুণাবলী, সঠিক নিয়াত, অত্যন্ত সুন্দর হৃদয় এবং মুসলিম জনতাকে সদোপদেশ প্রধান দ্বারা। তারা এসব করেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়। তাঁরা আত্মসংযমী, দয়ালু, নম্র ও বিনয়ী। তাঁরা কাউকে অভিশাপ দেন না, কারো ক্ষতি করেন না, নিজেকে অপরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, না তাঁরা হিংসা পোষণ করেন ওদের প্রতি যাদের স্তর তাদের উপরে। তাঁদের দীনতায় কোনো কৃত্রিমতা নেই, না তাঁরা নিজেকে জাঁকালো ভাবেন। তারা দুনিয়াকে ভালোবাসেন না।”[৫]

হাদিস ৫

হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: “পৃথিবীর জমিন কখনও ৪০ ব্যক্তির অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হবে না। এদের সবাই আল্লাহর একান্ত বন্ধু (ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিসসালাম)। এদের দু’আর বরকতেই পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হয় এবং (জিহাদে) বিজয় নিশ্চিত হয়। কেউ একজন মৃত্যুবরণ করলে অপর একজন দ্বারা আল্লাহ তা’আলা শূন্যস্থান পূরণ করেন।” ক্বাতাদা বলেন, “আমরা মনে করি নিঃসন্দেহে হাসান বসরী এদেরই একজন।”[৬]

হাদিস ৬

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, “আমি মসজিদে প্রবেশ করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, “হে আবু হুরাইরাহ! এখনই এক ব্যক্তি মসজিদের দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে, যে হচ্ছে পৃখিবীর ৭ জনের একজন। এ ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলা দুনিয়ার শাস্তিকে পাল্টে দেন।” তাঁর বাক্যটি শেষ হতেই একজন হাবশি মসজিদে প্রবেশ করলো। সে ছিলো টেকো ও লেংড়া। তার মাথায় ছিলো পানির পাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আবার বললেন, “হে আবু হুরাইরাহ! এই তো সে

---

[৫] হাকিম, ইবনে আবিদ দুনইয়া।

[৬] তাবারানি, ৪-২৪৭; সুয়ূতি - হাউই লিল-ফাতাওই ২:২৪৭; আবু নুঈয়াম - মা’রিফাতুস সাহাবা ১০:২৪৪; ইবনে হিব্বান - তারিখ ২:২৪৮ (জঈফ); ইবনে আসাকির ১:২৯৮।

ব্যক্তি।" তিনি লোকটিকে তিনবার বললেন, "ইয়াসারে স্বাগতম (অন্য বর্ণনায় আছে- হিলাল)।" বর্ণনাকারী বলেন, এ লোকটি এক সময় মসজিদে ঝাড়ু দিতো। সে ছিলো মুগিরা ইবনে শু'বানের ক্রীতদাস।"[৭]

একটি বর্ণনায় মহিলাদের মধ্যেও স্তরবিশিষ্ট ওয়ালিয়াহ থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইবনে আসাকির (১:১২৯) এবং ইবনে আবি খাইসামী বর্ণনা করেন, "উসমান ইবনে 'আতা তার পিতার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, যিনি বলেন, 'আবদাল হচ্ছেন ৪০ জন মানবসন্তান।' 'আতা বললেন, '৪০ জন পুরুষ'। তাঁর পিতা বললেন, 'পুরুষ বলো না। বলো মানুষ। কারণ এদের মধ্যে মহিলাও থাকতে পারেন।'"[৮]

আউলিয়ায়ে কিরামের সংখ্যা

হাফিজ শাখাওয়ি তাঁর মাক্কাদিসুল হাসানা (পৃ. ১০) এবং হাফিজ সুয়ূতি তাঁর হাওয়ি লিল ফতাওয়িতে বলেন, 'ইবনে আসাকির (তারিখে দিমাশক্ব ১:৩০০) এবং হাফিজ আল-খাতিব (তারিখে বাগদাদ ৩: ৭৫-৭৬) উভয়ে উল্লেখ করেছেন, আবু বকর খাত্তানি বলেন:

"নুক্বাবাদের সংখ্যা ৩০০, নুজাবা আছেন ৭০ জন, ৪০ জন আবদাল, ৭ জন আখইয়ার, 'উমুদ ৪ জন এবং গউস ১ জন। ..."

শায়খ ইয়াফি'ই তাঁর কিফায়াতুল মু'তাক্বিদ গ্রন্থে লিখেন:

"সালিহীনের সংখ্যা অনেক। তারা সাধারণ্যের মধ্যে বিচরণ করেন। সবার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে এরা কাজে নিয়োজিত আছেন। সালিহীনের তুলনায় নুজাবার সংখ্যা কম। আর নুক্বাবাদের সংখ্যা নুজাবাদের তুলনায় কম। এ উভয়

---

[৭] হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাকিম তিরমিযি তাঁর নাওয়াদিন এবং খাতমুল আউলিয়ায়, আবু নু'আইম তাঁর হিলইয়াতুল আউলিয়া ও মা'রিফাতুস সাহাবায়, ইবনে আসাকির তাঁর তারিখে, রুয়াইনি তাঁর মুসনাদে, আবু মুহাম্মদ আল-খাল্লাল তাঁর কারামাতুল আউলিয়ায়, ইবনে আসির তাঁর উসদ আল-গ্বাবায়, ইবনে হাজর তাঁর তামিযুস সাহাবায় এবং অন্যান্য।

[৮] ইমাম সুয়ূতি - জামি' আস-সগির, ৩০৩৬; দাইলামি -আল-ফিরদাউস, ১:১৫৪-৫৫; 'আতা হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে।

দল চিহ্নিত আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে মিশে থাকেন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে আবদাল আছেন। একের পর এক আবদাল বহাল থাকেন। আওতাদের সংখ্যা ৪। এদের একজন আছেন সিরিয়ায়, একজন ইয়ামনে, একজন পূর্বে আর একজন পশ্চিমে। কুতুব পৃথিবীর চারটে দিঘন্তে ভ্রমণ করেন- ঠিক যেভাবে তারকারাজি পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়।

কুতুবদের অবস্থা সাধারণ মানুষ থেকে আড়ালে থাকে। তাঁর অবস্থা এমন যে, একই সময় তিনি জ্ঞানবান ও অজ্ঞ, বুদ্ধিহীন ও বুদ্ধিমান, কাছে ও দূরে, ভদ্র ও কর্কষ, নিরাপদ ও বিপজ্জনক। এককথায়, সাধারণ মানুষের নিকট তিনি ইতিবাচক ও নেতিবাচক গুণাবলীর অধিকারী মনে হয়।

আওতাদদের হাল শুধুমাত্র বিশেষ একদল লোকের নিকট প্রকাশ পায়। আবদালদের হাল বিশেষ বুজুর্গ ও মা'রিফাতপন্থীদের নিকট ধরা পড়ে। নুক্বাবা ও নুজাবাদের হাল সাধারণ্যের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তবে তাঁরা একে অন্যকে জানেন-চিনেন। সালিহীনদের হাল সবাই অবগত হয়। ...”

উক্ত বর্ণনা ইবনে হাজর মক্কী হাইসামী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ফাতওয়া হাদিসিয়ায় (পৃ. ৩২২-৩২৩) উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইবনে আবিদীন হানাফি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ইযাবাতাল গউস কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আবিদীন হানাফি রাহিমাহুল্লাহ প্রথমে ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন তাঁর ফাতওয়ায়:

“আবদাল সম্পর্কে বহু বর্ণনা বিদ্যমান। এদের অনেকটাই সহিহ। কিছু আছে জঈফ। আর কুতুব সম্পর্কে পরবর্তী (আসার) বর্ণনা পাওয়া যায়। আর গউস সম্বন্ধে কোনো প্রতিষ্ঠিত বর্ণনা পাওয়া যায় না।”

এ উদ্ধৃতি শেষে তিনি (ইবনে আবিদীন) বলেন:

“আমরা এখন ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি তুলে ধরছি ‘গউস’ মানে ‘কুতুব’ হওয়া সম্পর্কে। তিনি বলেন, ব্যাপার হলো গউস সম্পর্কে এতো বেশি জানাজানি হয়ে গেছে যে, এটা সত্য হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।”

কুরআন-সুন্নায় কাশফ ও ইলহাম প্রসঙ্গ

তাসাওউফ তিনটি ভাগে বিভক্ত: ১. ইলম (সঠিক আমলের জ্ঞান), ২. আমল (জ্ঞানকে আমল দ্বারা অলঙ্কৃতকরণ) ও ৩. হাল (আধ্যাত্মিক স্তর - এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক আমলের ফলাফল- একে তরিকতের ফলও বলা যায়।) এ প্রসঙ্গে আমরা তৃতীয়টির উপর আলোকপাত করবো।

হালের বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন: কাশফ (আধ্যাত্মিক পর্দান্মোচন), ইলহাম (প্রভুপ্রদত্ত জ্ঞান), কারামত (অতিস্বাভাবিক ঘটনা ঘটানো), ইশকে ইলাহী (প্রভুর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা)। তাসাওউফের উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রভুপ্রেমে ডুবে যাওয়া। এটাই মূল লক্ষ্য। কাশফ, ইলহাম, কারামত- এগুলো মূলত চলার পথের জিনিসপত্র। কারোর ক্ষেত্রে এগুলো প্রকাশ পায়- অন্যদের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না। তবে কুরআন ও হাদীসে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান।

কাশফ ও ইলহাম

উভয়টি মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সরাসরি জ্ঞান। তবে নবী-রাসূল ও ওলিদের ক্ষেত্রে এগুলো কীভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। পরিভাষাও ভিন্ন। নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে যেসব অতিস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে সেগুলোকে বলে "মু'জিযা"। অপরদিকে ওলিআল্লাহর মাধ্যমে যা অতিস্বাভাবিক ব্যাপার উন্মোচন হয় তাকে বলে "কাশফ" ও "ইলহাম"। নবী রাসূলগণ ওহির মাধ্যমেও বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

ইলহাম (অনুপ্রেরণা) আসতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি। এবং এর সঙ্গে থাকতে পারে সাকিনা (প্রশান্তি)।

ওহি (প্রকাশ) সর্বদাই পরিষ্কার, স্পষ্ট এবং সঠিক। অপরদিকে ইলহাম হতে পারে অস্পষ্ট এবং অপূর্ণ। এ কারণেই শায়খ আবুল হাসান শাদিলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কারোর আধ্যাত্মিক প্রকাশ যদি প্রতিষ্ঠিত শরীয়ত এবং কুরআন-হাদিসের পরিপন্থী হয়, তখন এ কাশফ-ইলহামকে উপেক্ষা করতে হবে। একে আমলে নেওয়া বৈধ নয়।"

পবিত্র কুরআন শরীফে কাশফ ও ইলহাম প্রসঙ্গে একাধিক আয়াত আছে। যেমন:

اتَّقُوا اللَّهَ * وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ * وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আল্লাহকে ভয় করো; এবং আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দেবেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন।" (সূরা বাক্বারাহ (২): ২৮২)

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ * وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।" (বাক্বারাহ (২): ২৬৯)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ

"নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।" (সূরা হিজর (১৫): ৭৫)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

"অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।"[৯] (সূরা কাহাফ (১৮): ৬৫)

হযরত বাগ্বভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (খিজির আ.) আভ্যন্তরীণ জ্ঞান (ইলমে বাতিন) শিক্ষা দিয়েছিলেন ইলহামের মাধ্যমে (তফসিরে বাগ্বভী)।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

---

[৯] নোট: খিজির আলাইহিসসালাম অধিকাংশ তাফসিরবিদ বলেছেন নবী ছিলেন না। বরং তিনি ওলি ছিলেন। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিস ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহও একমত (মাজমুআল ফাতওয়াহ, ৪:৩৩৮)।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا * فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

"তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত: চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।"[১০] (সূরা হাজ্জ (২২): ৪৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

"আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।" (সূরা ইউসুফ (১২): ১০৪)

সুলাইমান আলাইহিসসালামের দরবারের এক ওলি আসিফ বিন বারখিয়া কীভাবে বিলকিসের সিংহাসন মুহূর্তের মধ্যে বাদশাহর সম্মুখে এনে দিয়েছিলেন, তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

"কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব।" (সূরা নামল (২৭): ৪০)

পবিত্র কুরআনে আরো কিছু উপমা আছে ওলিআল্লাহদের কারামত বিষয়ে। যেমন:

---

[১০] 'বাসার' অর্থ বাহ্যিক চোখ। 'বাসিরা' অর্থ আধ্যাত্মিক চোখ। সাহাবা খালিদ ইবনে মাদান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন: "প্রত্যেক বান্দাকে দু'টি বাহ্যিক চোখ দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা সে দুনিয়ার সবকিছু দেখতে পায়। এগুলো কপালের নিচে। আরো দু'টি চোখ দেওয়া হয়েছে যেগুলো আছে হৃদয়ে। এ দুটো দ্বারা সে আখিরাতের চিত্র অবলোকন করে। সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর বান্দার অর্ন্তদৃষ্টি খুলে দেন। সে তখন গুপ্ত জিনিসও দেখতে পায়। (তাফসিরে তাবারি - হাসান)

১. খিজির আলাইহিসসালাম: যদিও তাঁকে কেউ কেউ নবী বলেছেন তথাপি তিনি যে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। মূসা আলাইহিসসালাম নবী হয়েও এ বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। কালামুল্লাহর ১৮:৬৫ আয়াতে যে বর্ণনা এসেছে তার ওপর তাফসির করতে যেয়ে ইমাম বাগ্‌ভী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন: "আল্লাহ তাঁকে (খিজির আ.) আভ্যন্তরীণ (বাতিন) জ্ঞান দান করেছিলেন ইলহামের মাধ্যমে।" আমরা এই আয়াতটি ইতোমধ্যে তরজমাসহ তুলে ধরেছি।

২. বিবি মরিয়ম আলাইহাসসালাম: তিনি ছিলেন সিদ্দীকা (দেখুন কুরআন ৪:৬৯ এবং ৫:৭৫)। তিনি অনেক কারামাতের অধিকারী ছিলেন। যেমন, গায়েবি খাবার গ্রহণ (কুরআন ৩:৩৭); পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই শিশু (ঈসা আ.) জন্ম দিয়েছেন (কুরআন ৩:৪৭ ও ১৯:২০) এবং খেজুর পতিত হওয়া (কুরআন ১৯:২৫)।

৩. আসহাবে কাহাফ: এসব যুবক (কেউ কেউ বলেন তারা ছিলেন ৭ জন ও একটি কুকুর) নবী বা রাসূল ছিলেন না। অথচ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ৩০৯ বছর গুহার ভেতর ঘুমন্তাবস্থায় জীবিত রেখে দিলেন।

৪. অন্যান্য দৃষ্টান্ত: নবী-রাসূল ছাড়া অনেকে এক ধরনের 'ওহি' প্রাপ্তির কথাও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন বিবি মরিয়ম (১৯:২৫); মূসা ও হারুন আলাইহিমাসসালামের মাতা (২০:৩৮ ও ২৮:৭) এবং ঈসা আলাইহিসসালামের সাথীগণ (৫:১১১)। প্রায় সব তাফসিরবিদ এব্যাপারে একমত যে, উক্তসব ক্ষেত্রে 'ওয়াহি' অর্থ 'ইলহাম' ও 'কাশফ'। এগুলো নবী-রাসূলদের প্রতি নাজিলকৃত ওয়াহি থেকে ভিন্ন। সুতরাং সাধারণ মানুষ 'কাশফ' ও 'কারামতের' অধিকারী হতে পারেন যদি আল্লাহর মর্জি হয়।

হাদিস শরীফে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যাকে আল্লাহ তা'আলা দান করতে চান তাকে তিনি দ্বীনের সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করেন। আর আমি শুধু প্রচার করছি- আল্লাহই দান করেছেন।" (বুখারী-মুসলিম)

অন্য হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মু’মিনের আভ্যন্তরীণ দৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ থেকো, কারণ সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখতে পায়।” (তিরমিযি- হাইসামী বলেন, এ হাদিস সহীহ)

অপর এক হাদিসে আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে কেউ স্বপ্নে আমাকে দেখে, সে সত্যিই আমাকেই দেখে। কারণ শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না। আর মু’মিনের স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের একভাগ।” (বুখারি-মুসলিম)

সালাফে সালিহীনের বাণী

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হচ্ছে একটি নূর। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে এ নূর দ্বারা পথনির্দেশনা করেন। এতে খুব বেশি বিষয় জড়িত নয়।”

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন: “জ্ঞানের মধ্যে বেশি বেশি বর্ণনা নয়- বরং জ্ঞান হচ্ছে একটি নূর, যা আল্লাহ তা’আলা অনুগ্রহ করে বান্দার অন্তরে প্রোথিত করেন।”[১১]

তাবেঈ হযরত তাবিদ বুনাই রাহিমাহুল্লাহ দু’আ করতেন, “হে আল্লাহ! আপনি যদি কাউকে তার কবরের ভেতর নামায আদায়ের মর্যাদায় ভূষিত করেন, তাহলে আমাকে এ মর্যাদা দান করুন।” এদিনই বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয়। আরেক তাবিঈ হযরত জুবাইর বলেন, “আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, তাবিত বুনানিকে যেদিন কবরে রাখা হলো তখন আমি ও আরেকজন যার নাম হলো হুমাইদ তাবীল উপস্থিত ছিলাম। কবরে যখন আমরা পাথর বসাচ্ছিলাম তখন একটি পাথর কবরের ভেতর পড়ে গেলো। আমি স্পষ্ট দেখলাম হযরত বুনানী নামায পড়ছেন!”[১২]

---

[১১] তাফসিরে ইবনে কাছির, ৩:৫৫৫

[১২] এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে: মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ৮:৩১৭, বাইহাক্বি ৩:১৫৫ # ৩১৮৯, ইমাম আহমদ তাঁর কিতাব যুদ-এ, ইমাম জাহাবী তাঁর সিয়ারে ৫:২২২- সবাই এটি সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। **নোট:** দুটি কারণে এটা একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা। ১. তাবিঈন মৃত ব্যক্তিকে দেখতে পেরেছেন ও ২. মৃত ব্যক্তি নামায পড়ছেন, সে দৃশ্যও জীবিত ব্যক্তি দেখলেন।

ওয়াসিবাহ ইবনে মাবাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, তুমি কী বির সম্পর্কে বলতে এসেছো? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, বিচারের জন্য নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন করো।” (মুসনাদে আহমদ - হাসান হাদিস)

আউলিয়ায়ে কিরামের কারামত

আসহাবে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "কতো লোক আছে যাদের চুল এলোমেলো, ধূলোবালিতে আবৃত, পরনে দু' টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছুই নয়, অজানা-অচেনা, যারা আল্লাহর নিকট আরজি পেশ করে এবং তা কবুল হয়ে যায়।" এখানে তিনি বলেন নি, এরা ঠিক কোন্ জিনিসটি আল্লাহর নিকট চায়।[১৩]

হযরত সাহল বিন আবদুল্লাহ তুশতরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "যে কেউ সত্যিকার অর্থে এবং ইখলাসের সাথে চল্লিশ দিনের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করবে, সে কারামাত প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। যদি সে এতে ব্যর্থ হয় তাহলে বুঝতে হবে দুনিয়া ত্যাগে সে আন্তরিক ছিলো না।" কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, সে কিভাবে কারামত প্রদর্শন করবে? তিনি জবাব দিলেন: "সে যাকিছু চায়, যেভাবে চায় ও যেখান থেকে চায় তা নিতে পারবে।"[১৪]

(১) **আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু:** একদা তিনি এক ভ্রমণে ছিলেন। একদল লোককে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখলেন। তারা একটি সিংহ দেখে ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি সিংহকে রাস্তার উপর থেকে তাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন: "আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ওসব বস্তুর উপর ক্ষমতা দিয়েছেন যা সে ভয় করে। যদি সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, তাহলে তার উপর কারো ক্ষমতা থাকবে না।" এটা একটি মশহুর বর্ণনা।[১৫]

(২) **হযরত আলী বিন হাদ্বারামী রাদ্বিআল্লাহ আনহু:** একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী বিন হাদ্বারামী রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে একটি

---

[১৩] মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান অনূদিত ও খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া থেকে প্রকাশিত (পাণ্ডুলিপি) রিসালাতুল কুশাইরী, পৃ. ৪১০।

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

[১৫] রিসালাতুল কুশাইরী, বঙ্গানুবাদ পৃ. ৪০৯।

অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি ও তাঁর গন্তব্যস্থলের মাঝখানে একটি সাগর ছিলো। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সর্বাধিক বড়ো নামে [ইসমে আজম] ডাক দিলেন। এরপর সকল সৈন্যদেরকে নিয়ে পানির উপর দিয়ে হেঁটে ওপারে চলে গেলেন।[১৬]

(৩) **আব্বাদ বিন বিশর ও উসাইদ বিন হুজাইর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা:** এক রাতে উভয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহ থেকে বেরিয়ে আসলেন। অন্ধকার রাতে হাঁটার সময় একজনের হাতের যষ্টির মাথা উজ্জ্বল হয়ে ওঠলো ও বাতির মতো তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে দিল।

(৪) **সালমান ফারসি ও আবু দারদা রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা:** একদিন উভয় সাহাবীর সামনে একটি বড়ো পাত্র ছিলো। হঠাৎ পাত্রটি আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলো। তাঁরা উভয়ে এই প্রশংসার বাক্যগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলেন।[১৭]

হযরত খুবাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আমর ইবনে উমাইয়াহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সম্পর্কে জানতে গোয়েন্দা হিসেবে পাঠালেন। যে স্থানে হযরত খুবাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে যখম অবস্থায় বেঁধে রাখা হয়েছিল আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। আমি কুরাইশ পাহারাদারের চোখ এড়িয়ে ভেতরে ঢুকে খুবাইব রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বাঁধনমুক্ত করলাম। তিনি মৃতপ্রায় অবস্থায় মাটির ওপর পড়ে রইলেন। আমি কিছুদূর সরে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি তিনি সেখানে নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর কোনো সন্ধান মিলে নি। আজ পর্যন্ত তাঁর লাশ পাওয়া যায় নি। মনে হলো মাটি তাঁকে তার ভেতরে নিয়ে গেছে।[১৮]

---

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-৪১০।

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০।

[১৮] হায়াতুস সাহাবাহ।

হযরত সাফিনাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিম হযরত সাফিনাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি একদা নৌকাযোগে ভ্রমণে ছিলাম। একসময় নৌকাটি ভেঙ্গে গেলো। আমি একখণ্ড কাঠের ওপর কোনমতে ভাসতে থাকি। এক পর্যায়ে বড়ো একটি ঢেউ এসে আমাকে ছোট্ট একটি ঝোপের ভেতর ছুড়ে মারলো। সেখানে ছিলো একটি হিংস্র সিংহ। সে আমার দিকে এগিয়ে আসলো। মনে হলো এক্ষুণি খেয়ে ফেলবে। আমি সহাস করে বললাম, "হে বনের সিংহ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিম।" একথা শুনে সিংহ আমাকে তার কাঁধে তুলে নিলো। এরপর একটি রাস্তার উপর রেখে আস্তে আস্তে ডাক দিয়ে চলে গেলো। বুঝতে পারলাম তার নিজের ভাষায় আমাকে বিদায় দিয়েছে।[১৯]

হযরত আউফ ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আউফ ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "একদিন বিকেল বেলা বারিহা চার্চে আমি ঘুমোচ্ছিলাম। সে যুগে চার্চটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মানুষ ভেতরে যেয়ে নামায আদায় করতেন। নামাযের আওয়াজ আমাকে জাগ্রত করে তুললো। দেখলাম একটি সিংহ আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমি আমার তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। সিংহ কথাবলা শুরু করে দিল! বললো "অপেক্ষা করুন, আমাকে আপনার নিকট পাঠানো হয়েছে একটি বার্তাসহ। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ বার্তা কে পাঠিয়েছন?" সে বললো, "আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন। জেনে রাখুন, ইন্তিকালপ্রাপ্ত মুয়া'বিয়া হচ্ছেন বেহেশতের একজন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন মুয়া'বিয়া?" সে বললো, "মুয়া'বিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান।"[২০]

---

[১৯] প্রাগুক্ত।

[২০] হায়াতুস সাহাবাহ।

সুফিয়ান ইবনে হারবাদ ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা

ইবনে ওয়াহহাব বলেন, সুফিয়ান ইবনে হারবাদ ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া একটি নেকড়ে বাঘ দেখলেন। বাঘটি এক বালককে আক্রমণ করে ধরতে চেয়েছিল। বালকটি দৌড় দিয়ে হারাম শরীফের ভেতরে ঢুকে গেলো। নেকড়ে বাঘ আর তাকে আক্রমণ করলো না। উভয় সাহাবী ব্যাপারটি দেখে অবাক হলেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে নেকড়ে বাঘ কথা বলা শুরু করলো। বললো, "এর চেয়েও আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে এই: হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনুওয়ারায় আছেন। তিনি তোমাদের উভয়কে বেহেশতের দিকে পাড়ি জমাতে ডাক দিচ্ছেন আর তোমরা আগুনের দিকে যাচ্ছো।[২১]

হযরত আবু রাইহানাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু

বনি সা'দ এর গোলাম অরওয়াতুল আ'না বলেন, আবু রায়হানা নৌকাযোগে সাগর পাড়ি দিচ্ছিলেন। তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি দর্জি হিসেবে কাজ করতেন। নৌকা দিয়ে যাত্রার সময় তাঁর হাতের সুই সাগরে পড়ে যায়। তিনি দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! এই সুইটা আমার একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। অনুগ্রহ করে এটি আপনি ফিরিয়ে দিন।" আশ্চর্যের ব্যাপার সুইটি পানির উপর ভেসে উঠলো। তিনি তা তুলে নিলেন।[২২]

হযরত আ'লা বিন হাজরামী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "হযরত আ'লা বিন হাজরামীকে যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরেইনে প্রেরণ

---

[২১] প্রাগুক্ত।

[২২] প্রাগুক্ত।

করলেন তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তিনটি জিনিস আমি দেখতে পেলাম। এগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বাধিক অদ্ভুত ছিলো তা বলতে পারবো না।

প্রথমত: আমরা যখন সাগরপারে পৌঁছুলাম তিনি বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করো। আমরা তা-ই করলাম। আমাদের উটের পায়ের পাতা পর্যন্ত ভিজলো না।

দ্বিতীয়ত: আমরা একটি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলাম। আমাদের খাবার পানি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আমরা পিপাসার্ত হলাম। আ'লা বিন হাজরামী দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। হঠাৎ দেখা গেলো একটি ছোট্ট মেঘখণ্ড যার আয়তন ঢালের সমান হবে, কোত্থেকে আসলো এবং আমাদের উপর এ থেকে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। আমরা বৃষ্টির পানি জমা করে পান করলাম।

তৃতীয়ত: তিনি (হযরত হাজরামী) যখন ইন্তিকাল করলেন, আমরা তাঁকে বালুকার ভেতর দাফন করলাম। এরপর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মনে করলাম, কোনো হিংস্র জানোয়ার এসে তার মরদেহ খেয়ে ফেলবে। আমরা তাঁর কবরের নিকট ফিরে আসলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেখানে কোনো কবর খুঁজে পেলাম না।

অন্য বর্ণনায় আছে, কিসরা ইবনে মুকাবির আমাদেরকে দেখে বললেন, “আল্লাহর শুকুর, আমরা তাঁর মুকাবিলা করতে হবে না।” একথা বলে কিসরা নিজের জাহাজে আরোহণ করে পারস্যের দিকে যাত্রা করলেন।”[২৩]

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আমর ইবনে ’আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন মিসর বিজয় করলেন তখন একদল মিসরী তাদের ভাষায় ‘বানাহ’ নামক মাসে তাঁর নিকট আসলো। তারা বললো, “হে আমীর! নীল নদের ব্যাপারে আমাদের একটি ঐতিহ্য আছে। এই

[২৩] প্রাগুক্ত।

ঐতিহ্য রক্ষা না করলে পানি নদীতে থাকে না।” এ ঐতিহ্যটি কী জানতে চাইলে তারা বললো, “বানাহ্ মাসের বারো তারিক রাতে আমরা একটি কুমারী মেয়ে খুঁজে বের করি। তাকে উত্তম অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করে নীল নদে ফেলে দেই।”

তাদের কথা শুনে হযরত আমর ইবনে ‘আস এ ঐতিহ্যকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, “ইসলাম এমন জঘন্য ব্যাপার সমর্থন করে না। পারস্য বিজয়ের পর তাদের সকল আজগুবি ঐতিহ্যও বাতিল করা হয়েছে।” সুতরাং মিসরীরা বানাহ্, আবিব ও মিসরি নামক তিন মাস অপেক্ষা করলো। নীল নদে পানি প্রবেশ করলো না। মানুষ বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে মিসর ছেড়ে চলে যেতে লাগলো।

এ অবস্থায় হযরত আমর ইবনে ‘আস খলিফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট সবকিছু অবগত করে পত্র লিখলেন। তিনি প্রতিউত্তর লিখলেন ও জানিয়ে দিলেন, এই চিঠি পেয়ে তুমি নদীতে ফেলে দেবে। আমর প্রথমে পত্রের মধ্যে কী লেখা ছিলো তা পাঠ করলেন। এতে লিখা ছিলো: “এটা আল্লাহর গোলাম আমিরুল মু’মিনীন উমর থেকে নীল নদের প্রতি বলা হচ্ছে, তুমি যদি আগেকার দিকে নিজের ইচ্ছায় বহমান হয়ে থাকো তাহলে এখন বহমান হবে না। আর যদি এক মহাশক্তিধর আল্লাহর ইচ্ছায় বহমান হয়ে থাকো তাহলে আমরা সেই আল্লাহর নিকট আবদার জানাচ্ছি তোমাকে বহমান করে দিতে।”

হযরত ইবনে ‘আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এ পত্রটি সত্যিই নীল নদীতে ফেলে দিলেন। পরেরদিন যখন সবাই নদীর তীরে আসলো, তারা দেখলো নদীটি পানিতে পারিপূর্ণ হয়ে ওঠেছে।[২৪]

হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, এক অন্ধকার রাতে হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর নানা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[২৪] হায়াতুস সাহাবাহ।

ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও। বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসবো?" তিনি বললেন, না। সে একাই যাবে। ইতোমধ্যে আকাশে এক উজ্জ্বল বাতি দেখা গেলো। এ বাতির আলোকে পায়ে হেঁটে হযরত হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর মাতার কাছে চলে গেলেন।[২৫]

হযরত হামজা ইবনে আমর আসলামী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত হামজা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। রাত হওয়ার পর তাঁর নিকট থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রাতটি ছিলো খুব অন্ধকার। ঝড়ো বাতাসও ছিলো। আমি দেখলাম আমার হাতের আঙ্গুলগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। এ আলো দ্বারা মানুষ তাদের গৃহপালিত পশুগুলো একত্রিত করতে সক্ষম হলো। আমার আঙ্গুলগুলো অনেক সময় আলোকোজ্জ্বল ছিলো।[২৬]

হযরত তুফাইল দাওসী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত ইবনে আমর জিন নূরাইন তুফাইল দাওসী রাদ্বিআল্লাহু আনহু একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতলওয়ালা চাবুক সম্পর্কে দু'আ করেছিলেন। এর হাতল থেকে আলো বের হতো। তিনি রাতের বেলা বাতি হিসেবে এটি ব্যবহার করতেন।

এক হাদিসে পাওয়া যায়, হযরত তুফাইল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি নিদর্শন দিন যা

[২৫] প্রাগুক্ত।

[২৬] হায়াতুস সাহাবাহ।

দেখিয়ে আমার কওমকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে পারি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! তার জন্য একটি নিদর্শন সৃষ্টি করে দিন।"

হযরত তুফাইল বলেন, আমি আমার লোকদের দিকে চলে যাই। আমার দু'চোখের মধ্যখানে একটি উজ্জ্বল বাতি আসলো। এটাই যে নিদর্শন তা বুঝতে পেরে আমি আল্লাহর দরবারে দু'আ করলাম, "হে আল্লাহ! এ আলোটি আমার মুখ থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাও।" সাথে সাথে উজ্জ্বল বাতিটি আমার চাবুকর হাতলে চলে গেলো। লোকজন এটি দেখে একে অন্যের দিকে ইশারা করে বলাবলি করতে লাগলো। আমার চাবুকের মাথায় এটি একটি ঝুলন্ত বাতির মতো দেখাতো।[২৭]

হযরত আমর ইবনে আবসাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খাদিম বলেন, একদিন হযরত আমর ইবনে আবসাহ গবাদি পশু চরাতে গেলেন। বিকেল বেলা আমি তাঁকে দেখতে যাই। আমি দেখলাম তিনি ঘুমিয়ে আছেন এবং একখণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া দান করছে। তিনি সজাগ হওয়ার পরও মেঘখণ্ড আকাশে ভাসছিলো। তিনি আমাকে বললেন, "আমি যদি জানতে পারি যে, তুমি এ ব্যাপারটি কারো নিকট বলে দিয়েছো তুমি ও আমার মধ্যে ভালো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।" হযরত কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খাদিম বলেন, "আল্লাহর কসম! তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এ ব্যাপারটি কারোর নিকট বলি নি।"[২৮]

---

[২৭] প্রাগুক্ত।

[২৮] হায়াতুস সাহাবাহ।

হযরত উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা

হযরত উসমান ইবনে ক্বাসিম বর্ণনা করেন, উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা যেদিন হিজরত করেন সেদিন তিনি রোজাদার ছিলেন। রুহা অঞ্চলের শেষে আসার পর ইফতারের সময় হলো। তিনি এতোই পিপাসার্ত ছিলেন যে, ভীষণ কষ্টে সময় কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখা গেলো আকাশ থেকে একটি বালতি তাঁর সম্মুখে লটকে আছে। সাদা দড়িতে বাঁধা বালতির ভেতর পানি ছিলো। তিনি পিপাসা মিটিয়ে এই গায়েবি পানি পান করলেন।

উম্মে আইমান রাদ্বিআল্লাহু আনহা বলেন, এ দিনের পর থেকে আমি আর কোনোদিন পিপাসা অনুভব করি নি।[২৯]

হুসাইন বিন আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আবু 'আউন বর্ণনা করেন, একদা হযরত হুসাইন বিন আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু মদীনা মুনুওয়ারাহ থেকে মক্কা মুকাররমায় ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। যাত্রাপথে ইবনে মু'তী নামক এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। মু'তী একটি কূপ খনন করছিলেন। তিনি হযরত হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, “হযরত! এটা আমার নতুন কূপ। কয়েক দিন চলে গেলো আমি কূপ থেকে পানি উত্তোলনের চেষ্টায় আছি। বালতিতে সামান্য একটু উঠে মাত্র। আপনি দয়া করে দু'আ করুন, যাতেকরে বেশ পানি তুলতে পারি। হযরত হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, “কূপের কিছু পানি নিয়ে আসো।”

হযরত হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট নির্দেশমতো পানি নিয়ে আসা হলো। তিনি বালতি থেকে কিছু পানি মুখে তুলে নিয়ে গড়গড়া করে আবার বালতিতে পানি রাখলেন। এরপর বললেন, “যান, এই পানি এবার কূপের মধ্যে ফেলে দিন।”

---

[২৯] প্রাগুক্ত।

ইবনে মু'তী তাই করলেন। এরপর দেখা গেলো কূপের পানিই শুধু বাড়ে নি, পানির মধ্যে মিষ্টি স্বাদ অনুভুত হতে থাকে।[৩০]

হযরত উম্মে শারিক দাওসিয়াহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেন, হযরত উম্মে শারিক দাওসিয়াহ রাদ্বিআল্লাহু আনহা যখন হিজরত করেন তখন তাঁর সঙ্গে এক ইয়াহুদি ছিলো। রোযা অবস্থায় সন্ধ্যা হলো। উম্মে শারিক ভীষণ পিপাসার্ত ছিলেন। তাঁর সাথে পানি ছিলো না। ইয়াহুদি ও তাঁর স্ত্রীর নিকট পানি ছিলো। ইয়াহুদি স্ত্রীকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলো, "খবরদার! উম্মে শারিককে এক ফোটাও পানি দেবে না।"

প্রচণ্ড পিপাসাসহ উম্মে শারিক রাদ্বিআল্লাহু আনহা বিছানায় শুয়ে রইলেন। সামান্য তন্দ্রাবিভূত হওয়ার পরই তিনি লক্ষ করলেন এক বালতি পানি তাঁর বুকের উপর। সাথে একটি ব্যাগও আছে। তিনি পানি পান করে পিপাসা মেটালেন। এদিকে ইয়াহুদি রাগান্বিত হলো। স্ত্রীকে গালিগালাজ শুরু করে দিলো। উম্মে শারিক বললেন, "এই পানি তোমার স্ত্রী আমাকে দেন নি। আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।"[৩১]

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমি হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট এসে সালাম জানালাম। তিনি তখন খারিজীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন। আমাকে দেখে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "আহলান সাহলান আমার ভাই! গত রাতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমার কক্ষের জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'ওহে উসমান! তোমাকে এরা পরিবেষ্টন করে আছে?" আমি জবাব

---

[৩০] প্রাগুক্ত।

[৩১] হায়াতুস সাহাবাহ।

দিলাম, "জী হ্যাঁ"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কী তোমাকে পিপাসার্ত করেছে?" আবি বললাম, "হ্যাঁ। এরপর দেখলাম তিনি এক বালতি পানি এই জানালার সামনে লটকিয়ে রাখলেন। আমি এ থেকে প্রাণভরে পানি পান করলাম। আমার ভেতর এখনও শীতল পানিতে প্রশান্ত আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আরো বললেন, "তুমি কী চাও বলো। এদেরকে সারিয়ে দেবো না তুমি ইফতার করবে আমার সঙ্গে?" আমি বললাম, "আপনার সাথে ইফতার করবো।"

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে নরাদম হত্যাকারীরা এদিনই তাঁকে হত্যা করলো। তিনি তখন পবিত্র কুরআন পাঠ করছিলেন।"[৩২]

হানযালা ইবনে হিজায়াম রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত হানযালা রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেই বলেন: "আমার পিতা হিজায়ামের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে যাই। আমার পিতা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ককেয়জন দাড়িওয়ালা পুত্র আছে। এখন আমার সাথে যাকে দেখছেন সে সবার ছোট্ট। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ামাল্লাম আমাকে কাছে নিয়ে বসালেন। আমার মাথায় হাত মুবারক বুলিয়ে বললেন, "আল্লাহ তোমার উপর প্রচুর বরকত দান করুন।"

বর্ণনাকারী জাইয়্যাল বলেন, "আমি হযরত হানযালাকে দেখেছি। কোনো ব্যক্তির মুখে যখম হেতু বা অন্য কারণে ফোলা থাকলে, তিনি বিসমিল্লাহ বলে নিজের হাত দ্বারা বুলিয়ে দিলেই ফোলা কমে যেতো। এমনকি বকরির মধ্যে ফোলা থাকলে তিনি বিসমিল্লাহ বলে হাত দ্বারা বুলিয়ে দিতেন। অমনিতেই ফোলা কমে যেতো।"[৩৩]

[৩২] হায়াতুস সাহাবাহ।

[৩৩] হায়াতুস সাহাবাহ।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু

আবু সাফার থেকে বর্ণিত আছে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু হিজরায় যেয়ে ইরানী বনি মারাযিয়্যার সর্দাদের সাথে অবস্থান করেন। তাঁকে সতর্ক করা হলো যে, খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হতে পারে। তিনি বললেন, "বিষ আনো।" বিষ আনা হলে তিনি তা হাতে তুলে বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে ফেলফেন। আল্লাহর কী কুদরত! তাঁর কিছুই হলো না।

অন্য আরেক দিন এক ব্যক্তি হযরত খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নিকট এক থলেভর্তি মদ নিয়ে আসলো। খালিদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থলেটি হাতে নিয়ে বললেন, "হে আমার আল্লাহ! এ থলের ভেতরে যা আছে তা মধুতে পরিণত করে দিন।" এরপর দেখা গেলো সব মদ সত্যিই মধুতে পরিণত হলো।[৩৪]

উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমাদের লোকদের স্থানে নিয়ে যাও।" আমরা তাই সবাই বের হলাম। উবাই ইবনে কা'ব ও আমি সবার পেছনে ছিলাম। দেখলাম একখণ্ড মেঘ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসলো। হযরত উবাই বললেন, "হে আল্লাহ! এ অসুবিধাজনক মেঘখণ্ডকে আমাদের উপর থেকে সরিয়ে নাও।" আমরা যখন কাফেলার অগ্রবর্তীদের নিকস্থ হলাম তখন দেখলাম সবাই বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছেন। হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা দু'জন কীভাবে শুকনো রয়ে গেলে?" আমি জবাব দিলাম, "আবু মুনযির (কা'ব) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন এই বলে- হে আল্লাহ! আমাদের উপর থেকে অসুবিধাজনক মেঘখণ্ড সরিয়ে নাও।" হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, "তোমাদের প্রার্থনায় আমাদেরেও শরীক করলে না কেনো?"[৩৫]

---

[৩৪] প্রাগুক্ত।

[৩৫] হায়াতুস সাহাবাহ।

হযরত হুজর ইবনে আদি রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত হাবিব ইবনে সাহবান বলেন, হযরত হুজর ইবনে আদি রাদ্বিআল্লাহু আনহু বললেন, “কী! এক ফোটা পানি দুশমনদের নিকট চলে যেতে তোমাদের আটকে দিলো।” এক ফোটা বলতে তিনি দজলা নদী বুঝিয়েছিলেন। তিনি আরো বললেন, “এটা তো শুধুমাত্র দজলা নদী। কেউ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া মরতে পারে না। মূলত মৃত্যুর সময় নির্ধারিত হয়ে আছে।”

এরপর তিনি তাঁর ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায়ই দজলা নদীতে যেয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর সাথে অন্যান্যরা যারতার ঘোড়ায় চড়ে চললো। দুশমনরা এ দৃশ্য দেখে বলতে থাকে, “এরা মানুষ নয়- জিন! ভাগো।” তারা সবাই পালিয়ে গেল।[৩৬]

হযরত আমির ইবনে ফহাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু

উরওয়াহ বর্ণনা করেন, আমির ইবনে ফহাইরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু যখন শাহাদতবরণ করেন, তখন তাঁর দেহ খুজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। লোকজন বলতে লাগলো, ফিরিশতারা তাঁকে লুকিয়ে ফেলেছেন। অপর এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফিরিশতারা তাঁর দেহ লুকিয়ে ফেলেছেন এবং তাঁকে ইল্লিয়্যিনে নিয়ে গেছেন।[৩৭]

হযরত সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, “আমি জান্নাতুল বাক্বীতে হযরত সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কবর খননকারীদের একজন

---

[৩৬] প্রাগুক্ত

[৩৭] হায়াতুস সাহাবাহ।

ছিলাম। খনন করার সময় কিছু মাটি আমাদের উপর পড়ে গেলো। এই মাটি থেকে বেরিয়ে আসছিলো মিশক-আম্বরের সুঘ্রাণ।[৩৮]

হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ (২২-১১০ হি.)

১. পবিত্র হজ্জযাত্রায় একদল জ্ঞানী-গুণী মানুষ হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর সফরসঙ্গী ছিলেন। রাস্তার উপর একটি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করতে যেয়ে দেখা গেল পানির স্তর কূপের তলায়। আশেপাশে কোন দড়ি কিংবা বালতিও চোখে পড়লো না। তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে এসে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বিষয়টি অবগত করলেন। তিনি বললেন, আমি যখন নামাযে দাঁড়াবো তখন তোমরা সেই কূপের নিকট যাবে।

তিনি কিছুক্ষণ পর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নির্দেশ মুতাবিক তারাও কূপের নিকট গেলেন। কী আশ্চর্য! সবাই লক্ষ্য করলেন, কূপটি এখন কানায় কানায় পানিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং সবাই ইচ্ছেমতো পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলেন। একজন কিছু পানি তুলে একটি পাত্রে জমা রাখলেন- পরে পান করবেন এই বাসনা নিয়ে। কিন্তু দেখা গেলো পানির স্তর আবার নেমে নীচে চলে গেছে- ঠিক আগের মতো। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো না, তাই এমনটি হয়েছে।

২. কাফিলা পবিত্র বাইতুল্লাহর পথে চলছে। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাস্তা থেকে কিছু খেজুর সংগ্রহ করে অন্যান্য সদস্যদেরকে খেতে দিলেন। তাঁরা তা খেয়ে অবাক দৃষ্টিতে বীচিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এগুলো দেখতে যে ঠিক স্বর্ণের মতো লাগে! ঠিক তা-ই ছিলো। মক্কা শরীফ পৌঁছে স্বর্ণকারের দোকানে যেয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখলেন, এগুলো সত্যিই খাঁটি স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেছে।

---

[৩৮] প্রাগুক্ত।

হযরত আবদুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৭০-১৮৬ হি.)

১. নদীর পানি শুকানো: একদিন হযরত আব্দুল ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক খেয়াঘাটে অবস্থান করছিলেন। যাদের কাছে টাকা ছিলো শুধুমাত্র তাদেরকেই মাঝি তার নৌকোয় তুলে নিচ্ছিলো। নদীর ঘাটে অনেক ফকীর নদী পার হওয়ার জন্য বসে আছে। তারা মাঝিকে টাকা দিতে না পেরে নিরাশ ও পেরেশান- এমন সময় হযরত ওয়াহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবার সামনে ঘোষণা করলেন: "হে লোকসকল! আব্দুল ওয়াহিদের এই সংবাদ তোমরা নদীর নিকট পৌঁছাও- 'হে নদী! তুমি শুকিয়ে যাও!'"

সকল ফকীর মিলে ঠিক তা-ই করলো, বললো: হে নদী! হযরত আব্দুল ওয়াহিদ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, শুকিয়ে যাও! আল্লাহর কী কুদরত! কিছুক্ষণের মধ্যে নদীর পানি কমে গেল। সকলে তখন পায়ে হেটে নদী পার হতে সক্ষম হলেন।

২. আকাশ থেকে দীনারের পতন: হযরত সাঈদ বিন ইয়াহইয়া বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "অনেক কুরাইশ ব্যক্তি হযরত আবদুল ওয়াহিদ বিন জায়িদ [হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলিফা] রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে উপস্থিত হতেন। একদিন তারা এসে তাঁকে বললেন: 'আমরা অপর্যাপ্তি ও প্রয়োজনের স্বল্পতার আশঙ্কা করছি।' তিনি আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার সর্বোচ্চ নামসহ ভিক্ষা প্রার্থনা করছি। এসব নামের মাধ্যমে আপনি স্বীয় বন্ধুদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়াপরবশ হন। এগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার আপনজনদের মধ্যে যাঁরা পবিত্র তাঁদেরকে পথপ্রর্দশন করেন। আপনি আমাদেরকে দৈনিক প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করেন। আপনিই হৃদয়ের সঙ্গে শয়তানের সম্পৃক্ততা থেকে আমরা ও আমাদের সাথীদেরকে রক্ষা করেন। কারণ আপনি সর্বাধিক করুণাময় দাতা, যাঁর হিতসাধনের নেই কোনো শুরু কিংবা শেষ। এখনই, হে আমার প্রভু! এখনই!' তারপর আমরা শুনতে পেলাম ছাদের মধ্যে ঝনঝনানি শব্দ হচ্ছে। দিনার ও দিরহামের বর্ষণ শুরু হয়েছে! হযরত জাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন,

'আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সবকিছু ছাড়া যথেষ্ট দিয়েছেন।' কুরাইশরা এই অর্থ সংগ্রহ করলেন। কিন্তু হযরত জাহিদ কিছুই নিলেন না।"[৩৯]

হযরত ফুযাইল বিন আয়াজ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৮৭ হি.)

১. ইয়াহুদির ইসলামগ্রহণ: বান্দার হক্ব আল্লাহ তা'আলাও ক্ষমা করেন না। বান্দার হক্ব বান্দার নিকট থেকেই ক্ষমা করিয়ে নিতে হয়। ফুজাইল রাহিমাহুল্লাহ ডাকাত সরদার থাকতে কার কাছ থেকে কি কি মালামাল ছিনিয়ে আনা হয়েছে রেকর্ড রাখতেন। তাওবার পর সকলকে তাদের মালামাল ফেরৎ দিলেন ও ক্ষমা চাইলেন। সবাই মাল ফেরৎ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিল- কিন্তু এক ইয়াহুদী ছাড়া, সে একটি শর্ত দিয়ে বসলো।

সে বললো, আপনি যে ব্যাগটি আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তা স্বর্ণে পরিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু ফুজাইল তাকে বার বার কসম করে বললেন, "তোমার ব্যাগে স্বর্ণ ছিলো না!" ইয়াহুদী কিছুতেই মানলো না- সে বললো, ব্যাগভর্তি স্বর্ণ ফেরৎ দেওয়া ছাড়া আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।

বাস্তবে ইয়াহুদির ইচ্ছে ছিলো ফুজাইল বিন আয়াজকে পরীক্ষা করা। আল্লাহর দরবারে তাওবাহ তিনি করেছেন সত্য, কিন্তু তা কতটুকু আন্তরিক সে ব্যাপারে ইয়াহুদির সন্দেহ ছিলো। সে ফুজাইলকে বললো, "আচ্ছা ঠিক আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমার স্বর্ণভর্তি ব্যাগ ফেরৎ না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে মাফ না করে দেওয়ার কসম করেছি। তাই আপনার সুবিধার জন্য একটি কাজ করা যায়। আমার ঘরে ঢুকে একটি ব্যাগ দেখতে পাবেন যা স্বর্ণে পরিপূর্ণ আছে। আমি সেটা আপনাকে হাদিয়া দিলাম। এবার তা এনে আমাকে প্রদান করুন- এতে আমার কসম পরিপূর্ণ হবে এবং আমি আপনাকে ক্ষমা করতে সক্ষম হবো।"

---

[৩৯] ইমাম কুশাইরী রাহিমাহুল্লাহ- আররিসালাতুল কুশাইরী, বঙ্গানুবাদ -সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট, বাংলাদেশ।

ইয়াহুদির কথা মতো হযরত ফুজাইল ঐ ব্যাগটি নিয়ে এসে তার হাতে সোপর্দ করলেন। সে যখন ব্যাগটি খুললো তখন দেখা গেলো সত্যিই এতে শুধু স্বর্ণ বিদ্যমান। এবার ইয়াহুদী ফুজাইলকে আসল রহস্য খুলে বললো, "আপনি যে আল্লাহর দরবারে একান্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে খালিস দিলে তাওবাহ করেছেন এ ব্যাপারে আমি এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলাম। আমি তাওরাতে পাঠ করেছি, যে ব্যক্তি তার তাওবায় আন্তরিক তার হাতে বালুকণা পর্যন্ত স্বর্ণে রূপান্তর হতে পারে। আসলে ঐ ব্যাগে প্রস্তর ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আমাকে আপনি ইসলামে দীক্ষিত করুন!"

সুবহানাল্লাহ! ফুজাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইয়াহুদির কথা শ্রবণ করে অঝোর দ্বারায় কাঁদতে লাগলেন। দীর্ঘদিন ডাকাতির মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত থেকেও আন্তরিক তাওবার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা আল্লাহর দরবারে এ পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, পাথর স্বর্ণে রূপান্তর করে দিলেন মহান দয়ালু, মেহেরবান, ওয়াদুদ আল্লাহ তা'আলা। ফুজাইল ইয়াহুদিকে বললেন, বলুন:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল।"

২. মুজিবুদ দাওয়াত: হযরত ফুযাইল বিন আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিম আবুল আব্বাস বলেন: "যখন হযরত ফুযাইলের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলো, তিনি উপরের দিকে হাত তুলে দু'আ করলেন: 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার মুহাব্বাতের খাতিরে এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন!' আমরা নড়াচড়া করার পূর্বেই তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।"[৪০]

[৪০] প্রাগুক্ত।

হযরত হাবিবে আজমী রাহিমাহুল্লাহ

১. গায়েবি খাবার: হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন হিসেবে জীবন কাটাতে থাকেন। ভীষণ অভাব-অনটন হেতু জরুরী খাবার-দাবার ও রসদপত্রের জোগান হচ্ছিলো না তাঁর পরিবারে। তাঁর স্ত্রী এসব জোগাড় করে দিতে বার বার তাঁকে আবদার জানাচ্ছিলেন। একদিন তিনি ভোরে ওঠে চলে গেলেন হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বায়। বেশ গভীর রাতে বাড়িতে স্ত্রীর নিকট ফিরে আসলেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে? কাজ করে কিছু আয় করেছো? কিছু নিয়ে এসেছো?"

হাবিব আজমী জবাব দিলেন: "আমি যার কাজ করেছি, তিনি খুব দয়ালু। আমি বিনিময়ে তাঁর নিকট কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করি। সঠিক সময় উপস্থিত হলে তিনি প্রতিদান দেবেন। কারণ তিনি বলেছেন, "প্রতি ১০ দিন পর পর আমি বেতন দিই।"

বাস্তবে হাবিব আজমী খানক্বায় যেয়ে ইবাদতে মশগুল হতেন। তিনি কারো কাজ করতেন না। এভাবে দশদিন ইবাদত করলেন। ঐদিন যুহরের নামাজ শেষে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, আজ তো দশদিন পূর্ণ হয়েছে। আমি কী নিয়ে বাড়িতে যাবো? স্ত্রীকেই বা কী বলবো? তিনি গভীর চিন্তা-ভাবনায় পড়ে গেলেন।

কী আশ্চর্য! তাঁর অজান্তেই একব্যক্তি বাড়ির দরোজায় এসে হাজির হলেন। নিয়ে এসেছেন গাধার পিঠে করে কয়েক ব্যাগভর্তি আটা। আরেকজন নিয়ে আসলেন একটি দুম্বা এবং অপর আরেক ব্যক্তি আনলেন তৈল, মধু, মসলাপাতি ইত্যাদি। এসব বস্তু তাঁর ঘরের দরোজার সামনে রেখে সবাই প্রস্থান করলো। এরপর খুব সুদর্শন এক যুবক তিনশত রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘরের দরোজার কড়া নাড়লেন। হাবিব আজমীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে? কেনো এসেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "মালিক এসব বস্তু পাঠিয়েছেন। আপনি আপনার স্বামীকে বলবেন, 'তুমি তোমার কর্ম [নেক-আমল] বাড়াতে থাকো, আমরা তোমার বেতন বাড়িয়ে দেবো।'" একথা বলেই রৌপ্যমুদ্রা হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে যুবক প্রস্থান করলেন।

এদিকে রাত গভীর হয়ে আসলে হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। ভাবতে থাকেন, স্বীয় স্ত্রীর নিকট যেয়ে কী জবাব দেবেন? তিনি তো কিছুই নিয়ে আসেন নি। অত্যন্ত বিষণ্ন বদনে বাড়ির নিকটে আসলেন।

একী! সুস্বাদু তাজা রুটি ও শুরবার ঘ্রাণ! তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে ছুটে আসলেন। পরনের কাপড়ের আঁচল দিয়ে স্বামীর মুখখানা মুছে দিলেন। নিজের স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র যে একেবারে উল্টে গেছে! এতো হাসিখুশি উজ্জ্বল চেহারায় তাকে তিনি কখনো দেখেন নি। কী ব্যাপার? হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ অবাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে বললেন, "প্রিয় স্বামী! আপনি যে ব্যক্তির জন্য কাজ করছেন তিনি খুবই ভালো লোক। তিনি দয়ালু ও অতীব মেহেরবান এবং উদার। এই দেখো না, তিনি কতো জিনিস পাঠিয়েছেন! একজন সুদর্শন যুবক এসে এসব দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন, 'হাবিব যখন ফিরে আসবেন, তখন তাঁকে বলো, তোমার কাজের মাত্রা বাড়াও- আর আমি এর বিনিময় আরো বাড়িয়ে দেবো।'"

স্ত্রীর কথাগুলো শুনে হাবিব আজমীর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিভুত হয়ে পড়লেন। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, "আমার প্রিয়তমা স্ত্রী! দশ দিনের কাজের বিনিময়ে তিনি এতো কিছু পাঠিয়েছেন। এতো দয়ালু তিনি! আমি যদি আরো বেশি করে কাজ করি তাহলে- কে জানে, তিনি বিনিময়ে আরো কতো কিছু দেবেন।"

এদিন থেকে হযরত হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ জাগতিক সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমালেন।

২. বৃদ্ধার পুত্রের ফিরে আসা: একদা এক বৃদ্ধা হযরত হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর নিকট এসে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "হযরত! আমার একমাত্র পুত্র দীর্ঘদিন যাবৎ আমাকে একা রেখে কোথায় চলে গেছে। আমি তাকে ছাড়া আর বেঁচে থাকতে পারবো না। দয়াকরে দুআ করুন আল্লাহর দরবারে। তাকে আমি দেখতে চাই। দয়া করুন। আপনার দুআর বদলৌতে আল্লাহ তা'আলা হয়তো আমার জাদুকে বুকের মধ্যে আবার তুলে দেবেন।"

হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কোনো টাকা আছে?"

"হাঁ, দুটি দিরহাম আছে", বৃদ্ধা জবাবে বললেন।

"ওগুলো গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দাও।"

হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ এরপর দুআ করলেন। তারপর বৃদ্ধাকে বললেন, "ফিরে যাও! তোমার আদরের দুলাল তোমার নিকট ফিরে এসেছে!"

বৃদ্ধা বাড়িতে পৌঁছার পূর্বেই নিজের সন্তানকে দেখতে পেলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, "এই তো আমার আদরের দুলাল! এই তো আমার প্রিয় পুত্র!" তিনি ছেলেকে নিয়ে ছুটে আসলেন হযরত হাবিব আজমীর দরবারে। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, "এতো দিন কোথায় ছিলে বাবা?" জবাবে সে এক আশ্চর্য বর্ণনা দিলো।

ছেলে বললো, "আমি দীর্ঘদিন যাবৎ কিরমান শহরে বাস করছিলাম। আমি সেখানে একটি মাদরাসায় পড়াশুনায় ছিলাম। আজ আমার উস্তাদ নির্দেশ দিলেন, বাজার থেকে কিছু মাংস ক্রয় করে নিয়ে আসতে। মাংস ক্রয় করে যখন আমি ফিরতি যাত্রা করি তখন হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে বাতাস এসে আমাকে আকড়ে ধরে। আমি একটি গায়েবি আওয়াজ শুনলাম, "হে বাতাস! একে তার বাড়িয়ে নিয়ে চলো! হাবিবের দুআর বরকতে ও দুটি দিরহামের বিনিময়ে সে তার মায়ের নিকট ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে।" এরপরই দেখতে পেলাম আমি বাড়ির পাশে আমার মায়ের নিকট এসে গেছি।"

৩. আরাফার ময়দানে: পবিত্র হজ্জের মওসুম। বসরার লোকজন জিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ হযরত হাবিব আজমীকে শহরের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পেলেন। পরদিন ছিলো ইয়াওমুল আরাফাহ। সেখানে অবস্থানকারী বসরার হজ্জযাত্রীরা দেখলো তিনিও ইহরাম পরে আরাফার ময়দানে উপস্থিত আছেন।

৪. বিছানার নীচে টাকা: একদা বসরা শহরের লোকজন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লো। খাদ্যাভাবে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটলো। হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ ধনীদের কাছ থেকে টাকা ধার করে অভাবী লোকদেরকে খাবার ক্রয় করে দিলেন।

ঋণদাতারা যখন তাঁর নিকট এসে টাকা চাইলো, তিনি নিজের বিছানার নীচে থাকা টাকার থলে থেকে মুদ্রা বের করতে লাগলেন ও ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন। এই দিরহামগুলো কোত্থেকে আসলো তা কেউই বুঝতে পারলো না।

৫. জুব্বার পাহারাদার মুর্শিদ: হযরত হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর বাড়িটি বসরা শহরের দুটি রাস্তার সংলগ্নে ছিলো। তিনি গরম ও ঠাণ্ডা মওসুমে একটি পশুর চামড়ার তৈরি জুব্বা পরতেন। একদিন তিনি অযু করতে যেয়ে জুব্বাটি খুলে রাস্তার মধ্যে রাখলেন। ঘটনাক্রমে হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ এ রাস্তা দিয়েই আসছিলেন। জুব্বাটি রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে দেখে এটির নিকট যেয়ে মন্তব্য করলেন: "কোথাকার আজমী! সে এই জুব্বার মূল্য বুঝে না। এ জুব্বা এখানে থাকা উচিৎ নয়- এটি হারিয়ে যেতে পারে।" একথা বলে তিনি জুব্বাটি পাহারা দিতে লাগলেন। এদিকে হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ অযু সেরে এসে জুব্বার নিকট স্বীয় মুর্শিদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে যেয়ে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম হে ইমামুল মুসলিমীন! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?"

হযরত বসরী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "তুমি কী জানো না, এ জুব্বাটি এখানে থাকা উচিৎ নয়? এটা হারিয়ে যেতে পারে। বলো, কার নিকট এটি রেখে গিয়েছিলে?"

হাবিব রাহিমাহুল্লাহ জবাবে বললেন, "তাঁর নিকট রেখে গিয়েছিলাম, যিনি এটি দেখভালের দায়িত্ব আপনাকে দিয়েছেন!"

৬. পায়ে হেঁটে নদীর ওপারে: হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ কোনো এক জায়গায় যেতে ইচ্ছে করলেন। তিনি প্রথমে তুরাগ নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। এখানে দাঁড়িয়ে কী একটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। একটু পরই সেখানে এসে হাজির হলেন হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে ইমাম! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেনো?"

হাসান রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "আমি একটি জায়গায় যেতে চাচ্ছিলাম। নৌকা আসতে দেরি হচ্ছে।"

হাবিব আজমী বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, “ইয়া শাইখী! আপনি কী বলছেন? আমি তো আপনার কাছ থেকেই শিখেছি। তোমার হৃদয় থেকে অন্য সকল মানুষের হিংসা মুছে দাও, গাইরুল্লাহর কাছ থেকে নিজের হৃদয়কে দূরে রাখো। জেনে রাখো, ক্লেশ-কষ্ট একটি মূল্যবান নিয়ামত। সবকিছু হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ। এরপর পানির ওপর পা রেখে হাঁটতে থাকো!” এ কথাগুলো বলে হাবিব আজমী নদীর পানিতে পা রেখে হেঁটে চলে গেলেন। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকা হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফেরার পর লোকজন এসে জিজ্ঞেস করলো, “ইয়া ইমামুল মুসলিমীন! আপনার কী হয়েছিলো?”

তিনি জবাব দিলেন, “আমার শাগরিদ হাবিব এইমাত্র আমাকে তিরস্কার করলো! এরপর পানিতে পা রেখে চলে গেলো। এদিকে আমি চেতনহীন অবস্থায় এখানেই রয়ে গেলাম। যদি আগামীকাল আমাকে বলা হয়, অগ্নির উপর দিয়ে হেঁটে যাও এবং আমি এভাবে অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকি- তখন আমার কী হবে?”

পরবর্তীতে হাসান রাহিমাহুল্লাহ তাঁর এ শীর্ষস্থানীয় মুরিদকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে হাবিব! তুমি কীভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী হলে?”

“এর কারণ হচ্ছে আমি আমার হৃদয়কে সাদা বানিয়েছি। আর আপনি বানিয়েছেন ভীষণ কালো।”

হযরত হাসান রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করলেন, “আমার শিক্ষা অপরকে উপকৃত করলো আর আমি রয়ে গেলাম বঞ্চিত!”

৭. গায়েবি খাবার: একদিন হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর বাড়িতে বেড়াতে আসলেন। হাবিব রাহিমাহুল্লাহ খাবার হিসেবে হযরতের সম্মুখে দুটি রুটি ও সামান্য লবণ এনে দিলেন। হাসান রাহিমাহুল্লাহ খাওয়া শুরু করলেন। ইতোমধ্যে একজন ফকির এসে দরোজার কড়া নাড়লো। হাবিব আজমী মেহমানের সম্মুখ থেকে খাবারের থালাটি তুলে ফকিরের সামনে দিয়ে দিলেন! হযরত বসরী বললেন, “তুমি একজন ভালো লোক। আহ! যদি তোমার কিছুটা জ্ঞান থাকতো। তুমি তোমার মেহমানের সামন থেকে রুটি তুলে

নিয়ে ফকিরকে দিয়ে দিলে। উচিৎ ছিলো, এক অংশ ফকিরকে দেবে ও অপর অংশ মেহানের সামনে রাখবে।”

হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহ কিছুই বললেন না। এরপর একজন খাদিম বড়ো একটি থালা ভর্তি খাবার নিয়ে উভয়ের সামনে হাজির হলো। থালার মধ্যে একটি আস্ত বকরির ভুনা মাংস ছিলো। আরো ছিলো মিষ্টি ভাত, উত্তম রুটি ও পাঁচ শত দিরহাম। খাদিম থালাটি হাবিব আজমী রাহিমাহুল্লাহর সামনে রেখে চলে গেলো। তিনি দিরহামগুলো গরীবদের জন্য রেখে দিলেন। খাবারটুকু স্বীয় মুর্শিদ হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর সামনে রেখে বললেন, “অনুগ্রহপূর্বক আপ্যায়ন করুন ইয়া শাইখী!” হাসান রাহিমাহুল্লাহ কিছুটা খাওয়ার পর হাবিব রাহিমাহুল্লাহ পুনরায় বললেন, “ইয়া শাইখী! আপনি একজন উত্তম ব্যক্তি। তবে যদি আরো কিছু ভরসা রাখতেন, তাহলে ভালো হতো। জ্ঞানের সঙ্গে ভরসা রাখাও জরুরি!”[৪১]

৮. পীরকে লুকানো: কোনো একদিন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সৈন্যরা হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহর সন্ধানে ছুটোছুটি করছিলো। হাসান রাহিমাহুল্লাহ তখন হাবিব আজমীর খানকায় লুকিয়ে ছিলেন।

সৈন্যরা হাবিব রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলো, “আপনি কী আজ হাসানকে দেখেছেন?”

তিনি জবাব দিলান, “আমি তাঁকে দেখেছি।”

“তিনি কোথায়?”

“এই খানকায়।”

[৪১] এখানে কোনো ভুলবুঝাবুঝির সুযোগ নেই। হযরত হাসান বসরী ও তাঁর খলিফা হযরত হাবিব আজমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার মধ্যকার এসব ঘটনাবলী দ্বারা কারো মর্যাদা অপরের তুলনায় বেশি- সেটা ভাবা সঠিক হবে না। বাস্তবে উভয় ওলির বরকতেই এসব কারামতের ঘটনা ঘটেছিল। -গ্রন্থকার।

সৈন্যরা খানক্বায় প্রবেশ করলো। তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলো। হাসান বসরীকে কোথাও পেলো না। পরবর্তীতে হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা সাত বার আমার উপর হাত রেখেছে কিন্তু আমাকে দেখতে পায় নি!

সৈন্যরা প্রস্থান করার পর হাসান রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "হে হাবিব! তুমি তোমার মুর্শিদের হক্ব আদায় করো নি। তুমি আমার দিকে তাদেরকে লেলিয়ে দিলে!"

হাবিব আজমী বললেন, "হে আমার শায়খ! আপনি যে এখানে লুকিয়ে আছেন সে সত্যটা আমি ব্যক্ত করেছি মাত্র। মিথ্যা বললে আমরা উভয়েই তাদের হাতে আটক হতাম।"

হযরত রাবিয়া বসরী রাহিমাহাল্লাহ (৯৬-১৮৫ হি.)

১. কা'বা শরীফের আগমন: একদা হযরত রাবিয়া বসরী মক্কা মুকাররমার দিকে পবিত্র হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্র করলেন। অর্ধপথ অতিক্রমের পর তিনি কাফেলার সঙ্গে মরুভূমিতে বিশ্রাম নিলেন। এক পর্যায়ে তাঁর চোখে পড়লো পবিত্র কা'বা তাঁর সম্মুখে হাজির হয়েছে! তিনি বলেন, "আমি তো আল্লাহর ঘর চাই- এ ঘর পাওয়া আমার আকাঙ্ক্ষা নয়। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবো যিনি বলেছেন, "যে আমার দিকে এক পা অগ্রসর হবে আমি তার দিকে দৌড়ে আসবো।" আমি যে কা'বা দেখছি তার তো কোনো ক্ষমতা নেই।"

কা'বা যখন রাবিয়া বসরীর সম্মুখে আসলো ঠিক সে সময় বিখ্যাত শায়খ হযরত ইব্রাহিমি ইনবে আহদাম রাহিমাহুল্লাহ মক্কা মুকাররমায় ক'বা শরীফের সামনেই ছিলেন। তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন কা'বা শরীফ গায়েব হয়ে গেছে! তিনি বলেন, "আরে! কী হয়েছে? হয়তো আমার চোখে কোনো পর্দা পড়ে গেছে বুঝি!" এক গায়েবি আওয়াজ শুনলেন, "তোমার চক্ষে কিছুই হয়নি, কা'বা চলে গেছে একজন আবিদাকে স্বাগত জানাতে, যিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।"

২. আকাশে জায়নামায: একদিন হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ দেখতে পেলেন রাবিয়া বসরী রাহিমাহুল্লাহ একটি হ্রদের পারে বসে আছেন। কাছে যেয়ে

তিনি হ্রদে একখানা জায়নামায বিছিয়ে বললেন, “এসো রাবিয়া পানির ওপর নামায আদায় করি।” রাবিয়া রাহিমাহাল্লাহ স্বীয় জায়নামায উপরের দিকে ছুড়ে মারলেন। এটি জমিন থেকে কিছু উপরে শূন্যের ওপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বললেন, “হে হাসান! আসুন উভয়ে আকাশে নামায পড়ি! এরপর বললেন, আমরা যা করছি তা মাছে ও মাছি করতে পারে। এতে কোনো গৌরব নেই।”

হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬৬ হি.)

১. মাছ কর্তৃক সূচ নিয়ে আসা: বলখের শাসকবর্গ ও নেতারা একদা ছুটে আসলেন হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট। তারা বললেন, হযরত! অনুগ্রহ করে বলখে ফিরে চলুন। বাদশাহ হিসাবে আপনার অভাবে রাজ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। আপনি বাদশাহী ছেড়ে আজ এই ছেড়া বস্ত্র পরে যাযাবর অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চলুন! দয়া করে ফের দেশের বাদশাহী গ্রহণ করুন। এসময় ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দজলা নদীর তীরে বসে ছিড়ে যাওয়া স্বীয় জুব্বা সেলাই করছিলেন। তিনি মাথা উত্তোলন করে শাসকবর্গ ও সভাসদদের দিকে তাকালেন। হাতের সূচটি নদীর মধ্যে ছুড়ে মারলেন। তারপর বললেন, “হে দুনিয়ার শাসকবর্গ! আমার এই সূচটি নদী থেকে তুলে আনো দেখি!”

শাসকবর্গ ও নেতারা একে অন্যের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নদীর দিকে তাকিয়ে নির্দেশের সুরে বললেন: “হে নদীর মাছ! আমার সূচটি নিয়ে আসো!” কী আশ্চর্য ব্যাপার, ক্ষণকাল পরই দেখা গেল অসংখ্য মাছ একেকটি স্বর্ণনির্মিত সূই মুখে নিয়ে পানিতে ভেসে ওঠেছে! ইব্রাহীম আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আবার নির্দেশ দিলেন: “শুধুমাত্র আমার সূচটি নিয়ে আসো!”

একটু পরই দেখা গেল ছোট্ট একটি মাছ হযরতের সূচটি মুখে নিয়ে ভেসে ওঠেছে। তিনি এটি সংগ্রহ করে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা উপস্থিত শাসকবর্গকে

বললেন: "আমার রাজত্বের ব্যাপ্তি পুরো পৃথিবীব্যাপী। এবার বলুন, আপনাদের নগণ্য একটি রাজ্যের অধিকারী হওয়ার কী প্রয়োজন থাকতে পারে?"

২. জাবালে আবু কুবাইসের কম্পন: একদা মক্কা মুয়াজ্জমায় পবিত্র বাইতুল্লাহর নিকটে একজন সাথীকে নিয়ে হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বসা ছিলেন। তিনি তার সাথীকে নসীহত করতে যেয়ে বললেন: "আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু বান্দা আছেন যাদের নির্দেশে পাহাড়-পর্বত চলন্ত হয়ে যায়।" কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল বাইতুল্লাহ শরীফের অদূরে প্রাচীন 'আবু কুবাইস' পাহাড়ে কম্পন শুরু হয়ে গেছে! তিনি সাথে সাথে বললেন: "ওহে আবু কুবাইস পাহাড়! থামো! আমি তো শুধু নসীহত করছিলাম- কোনো নির্দেশ প্রদান করি নি।" বলাই বাহুল্য, আবু কুবাইসের কম্পন সাথে সাথে থেমে গেলো।

হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০০-২০৫ হি.)

১. কুকুরকে নিয়ে রুটি ভক্ষণ: হযরত মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহর একজন চাচা শহরের শাসক ছিলেন। একদিন তিনি শহরের নির্জন একটি অঞ্চলের নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। লক্ষ করলেন, তাঁর ভাতিজা মা'রুফ সেখানে বসে রুটি খাচ্ছেন। তাঁর সামনেই ছিলো একটি কুকুর। হযরত কারখী এক টুকরো রুটি নিজের মুখে দিচ্ছেন এরপর আরেক টুকরো কুকুরের মুখে ঢুকাচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে শাসক মহোদয় থমকে দাঁড়ালেন। ভাজিতার কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমার ভাতিজা! তুমি এ কী করছো? একটি কুকুরের সাথে বসে রুটি খাচ্ছো! তুমি কী এতে লজ্জা বোধ করো না?" তিনি জবাব দিলেন, "লজ্জাবোধের কারণেই আমি কুকুরকে রুটি দিচ্ছি!" এরপর তিনি আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করলেন। একটি উড়ন্ত পাখিকে ডাক দিলেন। পাখিটি নিচে নেমে তাঁর হাতে এসে বসে পড়লো। সে তার মাথা নিজের পাখা দ্বারা আবৃত করে রাখলো। মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "যে কেউ আল্লাহর সম্মুখে লজ্জিত হয়, অপর সবাই সেই

ব্যক্তির সামনে লজ্জাবোধ করে!” তাঁর শাসক চাচা একথা শুনে নির্বাক হয়ে গেলেন।[৪২]

২. দুষ্টদের ভাগ্য উন্মোচন: একদিন মা'রুফ কারখী রাহিমাহুল্লাহ শিষ্যদেরসহ কোথাও হেটে যাচ্ছিলেন। কোত্থেকে একদল মদ্যপ দুষ্ট লোক এসে তাদের নিকট দিয়ে চলতে শুরু করলো। এরা অত্যন্ত বে-আদবী ও শিষ্টাচার বহির্ভূত কর্ম করতে করতে হযরত ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে দজলা নদীর তীর পর্যন্ত গেলো। হযরতের সাথীরা এতে ভীষণভাবে বিরক্ত বোধ করলেন। তারা তাঁকে বললেন, “হে শায়খী! এই দুষ্ট লোকগুলোকে ধ্বংস করে দিতে আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, যাতেকরে এদের দৌরাত্ম্য থেকে পৃথিবীর জমিন মুক্ত হয়।” হযরত মা'রুফ কারখী হাত তুলে দু'আ করতে লাগলেন, “হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে এ লোকগুলোকে ইহজগতে হাসি-খুশির জীবন দান করেছেন, অনুরূপ পরকালেও তাদেরকে আরো বেশি শান্তি ও হাসি-খুশির জীবন দান করুন!” হযরতের সাথীরা বিস্মিত হয়ে বললেন, “হে আমাদের শায়খ! আপনি এ কীরূপ দু'আ করলেন? আমরা তো এর মর্ম বুঝতে পারলাম না!” হযরত শায়খ মা'রুফ কারখী বললেন, “আরে! আমি যার সাথে কথা বলেছি তিনি এর গোপন রহস্য অবগত আছেন। ... একটু অপেক্ষা করো। এখনই হয়তো সে রহস্য উন্মোচন হয়ে যাবে!”

কী আশ্চর্য! একটু পরই দেখা গেলো দুষ্ট লোকগুলো নিজেদের হাতের বাঁশি-বাদ্যযন্ত্র ও মদ ছুড়ে মারলো। তারা সবাই কচু পাতার মতো কাঁপছিলো। সকলে ছুটে আসলো হযরত মা'রুফ কারখীর নিকটে। অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে তাওবাহ করলো। জীবনে আর কখনো দুষ্টুমি করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে হযরতের হাতে বাইআত গ্রহণ করলো।

পরবর্তীতে হযরত কারখী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শাগরিদদের বললেন, “দেখলে তো কীভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে কবুল

[৪২] তাজকিরাতুল আউলিয়া।

করলেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে দজলায় ফেলে নিমজ্জিত না করে এবং কষ্ট না দিয়েই রক্ষা করেছেন।”[৪৩] সুবহানাল্লাহ!

৩. দয়ার দান: হযরতের প্রধান খলিফা শায়খ সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, এক ঈদের দিনে দেখতে পেলাম হযরত কারখী কিছু খেজুর-বীচি সংগ্রহ করছেন। জিজ্ঞেস করলাম, “ইয়া শায়খী! আপিন কী করছেন?” তিনি জবাব দিলেন, “আমি একটি ক্রন্দনরত শিশুকে দেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেনো কাঁদছো? সে বললো, ‘আমি একজন ইয়াতীম। আমার মা-বাবা এ পৃথিবীতে নেই। আজ ঈদের দিন। অন্যান্য শিশুদের পরনে আছে নতুন জামা-কাপড়। কিন্তু আমার নেই। পুরাতন ছেড়া বস্ত্র পরেছি। তাদের হাতে আছে বাদাম। আমার হাতে নেই।’ এ কারণে এই বীচিগুলো সংগ্রহ করছি। বিক্রি করে শিশুটির জন্য ক্রয় করবো নতুন জামা ও বাদাম। এগুলো পেলে সে খুশি হয়ে শিশুদের সঙ্গে খেলাধূলা করবে।”

হযরত সিররি সাক্বাতী বললেন, “হযরত! আপনার আশা পূরণ করতে আমাকে সুযোগ দিন। আপনি আর কষ্ট করবেন না।” এরপর হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ শিশুটির জন্য নতুন কাপড় এনে পরালেন, বাদাম কিনে তার হাতে দিলেন। শিশুটি অত্যন্ত আনন্দিত হলো। সে হাসিমুখে অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধূলা করতে ছুটে গেলো। হযরত সাক্বাতী বলেন, “এ মুহূর্তে আমার হৃদয়টি উজ্জ্বল নূরে আলোকিত হয়ে ওঠলো। আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত স্তরে পৌঁছালো।”[৪৪]

হযরত মুগলিস সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৩,২৫১ বা ২৫৭ হি.)

১. হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ নিচের ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন:

“একদিন আমি হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহকে দেখতে যাই। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি জানতে চাইলাম, “কী হয়েছে শায়খ?” তিনি জবাব দিলেন,

[৪৩] প্রাগুক্ত।

[৪৪] প্রাগুক্ত।

“আমার মধ্যে একটি বিশেষ চিন্তা জাগ্রত হয়েছে। আজ রাত আমি পানির জগটি টাঙ্গিয়ে রাখবো ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য। একটি স্বপ্ন দেখলাম, একজন হুর আমাকে এ কথাটি বলছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার সাথী? সে বললো, ‘আমি ঐ ব্যক্তির সাথী যে পানি ঠাণ্ডা করার জন্য জগ টাঙ্গিয়ে রাখে না। এর পর আমার টাঙ্গানো জগটি সে টেনে মাটিতে ফেলে দিলো। এই দ্যাখো সে জগটি!’ হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি দেখলাম, জগের ভাঙ্গা টুকরোগুলো মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এই টুকরোগুলো সেখানে এভাবেই ছিলো।”

২. নিচের বর্ণনাটিও হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন:

“এক রাতে আমি শান্তিমতো ঘুমোচ্ছিলাম। জেগে ওঠার পর আমার গোপন আত্মা আমাকে নির্দেশ দিলো সুনিজিয়া কবরস্থানে যেতে। আমি সেখানে গেলাম। দেখলাম এক ব্যক্তি উপস্থিত আছে। তাঁর চেহারা ভয়ঙ্কর। আমি ভয় পেলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, “হে জুনাইদ! তুমি কী আমাকে ভয় পাচ্ছো?”

জবাব দিলাম, “জী, ভয় পাচ্ছি।”

সে বললো, “তুমি যদি আল্লাহকে জানার মতো জানতে তাহলে একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করতে না।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি কে?”

জবাব দিলো, “ইবলিস!”

আমি বললাম, “আমি তোকে দেখতে চেয়েছিলাম।”

সে বললো, “যে মুহূর্তে তুমি আমাকে দেখেছো, সে মুহূর্তে নিজের অজান্তেই আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলে। তুমি কেনো আমাকে দেখতে চেয়েছিলে?”

আমি বললাম, “আমি জানতে চাচ্ছি, ফকরদের [দুনিয়াবিমুখদের] ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা আছে কী না?”

সে বললো, “না!”

জিজ্ঞেস করলাম, “কেনো নয়?”

সে বললো, "আমি যখনই তাদেরকে দুনিয়াবী বিষয়ে জড়িয়ে দিতে চাই, তখনই তারা পরকালের দিকে পাড়ি জমায়। আর যখন আমি পরকালীন বিষয়ে তাদেরকে জব্দ করতে চাই তখনই তারা প্রভুর দরবারে ছুটে যায়। আর ওখান পর্যন্ত যাওয়া আমার জন্য সম্ভব নয়।"

পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি যেহেতু তাদেরকে জব্দ করতে অপারগ, তুমি কী তাদের দেখতে পাও?"

সে জবাব দিলো, "আমি দেখতে পাই। যখন তারা সা'মায় যেয়ে ওয়াজদের [আধ্যাত্মিক পরমানন্দ] অবস্থায় পড়ে। আমি তাদের পরমানন্দ ও বিরহ-বেদনার চিৎকারের সূত্র দেখতে পাই।" একথা বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আমি মসজিদের ভেতর প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম সেখানে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ হাটুর উপর মাথা রেখে [মুরাক্বাবার অবস্থায়] বসে আছেন। [আমি কিছু বলার পূর্বেই] তিনি আমাকে বললেন, "সে [ইবলিস] মিথ্যাবাদী! সে হচ্ছে আল্লাহর দুশমন।" মাথা উত্তোলন করে বলতে থাকেন, "তাঁরা [ফকরকারীরা] আল্লাহর নিকট এতো বেশি মূল্যবান যে, তাঁদেরকে তিনি কখনো ইবলিসকে দেখতে দেন না।"

৩. একদিন হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ কোথাও যাচ্ছিলেন। লক্ষ করলেন রাস্তার পাশে মদ্যপ এক ব্যক্তি 'আল্লাহ! আল্লাহ!' বলছে। হযরত এগিয়ে গিয়ে তার মুখমণ্ডল ভালো করে ধুয়ে দিলেন। এরপর মন্তব্য করলেন, "লোকটি জানে না, অপিবিত্র মুখে সে সর্বাধিক পবিত্র নামটি উচ্চারণ করছে!" হযরত চলে যাওয়ার পর মদ্যপ লোকটির হুশ ফিরে আসলো। উপস্থিত লোকজন হযরত সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহর হাতে তার মুখমণ্ডল ধৌত করার ব্যাপারটি তাকে বললো। সে লজ্জিত হলো। নিজের নফসকে সে ধিক্বার দিতে লাগলো। বললো, "হে আমার দুষ্ট নির্লজ্জ নফস! হযরত সিররি সাক্বাতী তোকে মদ্যপ অবস্থায় দেখে গেছেন। এবার তুই আল্লাহকে ভয় ও তাওবাহ কর!" সুতরাং সে মদপানের নেশা ছেড়ে ইবাদতের নেশার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো।

এদিকে ঐদিন রাতে হযরত সিররি সাক্বাতী রাহিমাহুল্লাহ একটি গায়েবি আওয়াজ শ্রবণ করলেন:

> *“তুমি আমার সম্মানে তার মুখমণ্ডল ধুয়ে দিয়েছো।*
> *আর আমি তার অন্তরকে ধুয়ে দিয়েছি তোমার সম্মানে।”*

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯৮ হি.)

১. ক্রীতদাসীর মৃত্যু: বাগদাদের খলিফা হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন এক পরমাসুন্দরী তরুণী খাদিমাহ হিসেবে। এই মেয়েটিকে তিনি ৩ হাজার দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। খলিফা ক্রীতদাসী মেয়েকে বললেন, “খুব উত্তম ও মনোমুগদ্ধকর বস্ত্র ও অলঙ্কার পরে সাজগোজ করো। এরপর অমুক জায়াগায় চলে যাও। হযরত জুনাইদ বাগদাদীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের মুখের পর্দা উন্মোচন করবে। নিজের বাহার প্রদর্শন শেষে তাঁকে বলবে, “আমি অনেক সম্পদের মলিকা। কিন্তু আমার অন্তর দুনিয়াদারিত্বের প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে। আমি আপনার দরবারে এসেছি যাতে আপনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন এবং গ্রহণ করে নেবেন। আমি বাকি জীবন আপনার খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করবো আল্লাহর ওয়াস্তে। আমার অশান্ত হৃদয় আপনি ছাড়া কারোর নিকট শান্তি খুজে পাচ্ছে না।” এরূপ বলে নিজেকে খোলামনে প্রদর্শন করতে থাকবে। যাকিছু সম্ভব তা-ই করেও তাঁকে প্ররোচিত করবে।”

তরুণী একজন পুরুষ ভৃত্তকে সঙ্গে নিয়ে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর নিকট উপস্থিত হলো। উপরে উল্লেখিত নির্দেশনা মুতাবিক সবকিছু বললো। যে কোনো মানুষ সামনে আসলে স্বভাবতই দৃষ্টি পড়ে। এভাবে দৃষ্টি পড়লো তরুণীর প্রতি হযরত জুনাইদের। তিনি দৃষ্টি সরে নিয়ে নিরব রইলেন। কোনো জবাব দিলেন না। তরুণী তার আবদার পুনরায় ব্যক্ত করলো। হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ উপরের দিকে মাথা উত্তোলন করলেন। এরপর

"আহ!" বলে একটি শ্বাস তরুণীর দিকে ছুড়ে দিলেন। সাথে সাথে তরুণী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ছটফট করতে করতে কিছুক্ষণ পরই সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

দাসীর সঙ্গী ভৃত্য খলিফার নিকট দ্রুত ফিরে এসে যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিলো। মনে হলো খলিফার অন্তরে আগুন লেগেছে! তিনি কতো বড়ো পাপ করেছেন তা অনুধাবন করে বার বার তাওবাহ করতে লাগলেন। নিজে নিজেই বলতে থাকেন: "যে কেউ অপরের প্রতি আচরণ করে যা করা উচিৎ নয়, দর্শন করে যা সে দেখার কথা নয়।" আরো বললেন, "এরূপ মহাত্মন ব্যক্তিকে আমার নিকট ডেকে পাঠানো বে-আদবি হবে।" তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে চললেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর খানক্বার দিকে।

খলিফা হযরত বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম জানিয়ে বললেন, "ইয়া শায়খ! আপনার অন্তর এরূপ একটি সুন্দরী নারীকে ধ্বংস করে দিতে কীভাবে রাজী হলো?"

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ জবাব দিলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন! নিন্দুকদের প্রতি আপনার দয়ার মাত্রা এতোই বেশি হয়ে গেলো যে, তাঁদের কিছু অভিযোগের বদলা হিসেবে আমার চল্লিশ বছরের সাধনাকে ধূলিস্মাৎ করতে উদ্যোত হলেন! কিন্তু এসব ব্যাপারে আমি কে বিচার করার? আপনিও যে অনুরূপভাবে ধরাশায়ী হতে পারেন, তার কী কোনো নিশ্চয়তা আছে?" খলিফার মাথা নিন্মমুখী হয়ে পড়লো। বার বার ক্ষমা চেয়ে হযরতের নিকট থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।

২. **খ্রিস্টান ডাক্তার মুসলমান হওয়া:** একদিন হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর চোখে ব্যথা পেলো। একজন ডাক্তার আসলেন। পরীক্ষা করে বললেন, "আপনার চোখের ব্যথা অব্যাহত থাকলে ভেতরে যাতে পানি ঢুকে না সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।"

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ ইশার নামাযের জন্য ওযু সেরে নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লেন। ওযুর সময় চোখের ভেতর পানি ঢুকেছিল। কিন্তু জেগে ওঠার পর লক্ষ করলেন, চোখের ব্যথা সেরে গেছে।

তাহাজ্জুদ শেষে গভীর মুরাক্বাবায় থাকাবস্থায় এক গায়েবি আওয়াজ শুনলেন, "জুনায়েদ চোখের ভেতর পানি দিয়েছে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে। সে যদি একই নিয়তে দোযখের সকল [ঈমানদার ও পাপী] মানুষের মুক্তির জন্য আমার নিকট ভিক্ষা চাইতো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করে নিতাম।"

পরদিন ডাক্তার এসে দেখলেন হযরতের চোখ ভালো হয়ে গেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "শায়খ! আপনি কী করেছেন গতরাতে?"

হযরত জবাব দিলেন, "আমি নামাযের জন্য ওযু করেছি।" একথা শুনে খ্রিস্টান ডাক্তার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই এটা ছিলো সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নিরাময় দান। কোনো মানুষের পক্ষ থেকে নয়। ইয়া শায়খী! বাস্তাবে আমার চোখ রোগাক্রান্ত ছিলো আপনার নয়। আপনি ছিলেন [আমার অন্তরচোখের] চিকিৎসক, আমি নয়।"

৩. জিহাদের ময়দানে কাফির বীর যোদ্ধার ইসলামগ্রহণ ও শাহাদাতবরণ: হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর ৮ জন বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন যাঁরা তাঁর প্রতিটি নির্দেশ বিনাবাক্যে পালন করতেন। একদিন হযরত নির্দেশ দিলেন, "তোমাদেরকে আমার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে।" তাঁরা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সম্মুখে মুজাহিদ বাহিনী সারিবদ্ধভাবে তাদের মুকাবিলা করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন শত্রুসেনা এগিয়ে এসে হাঁক ছাড়লো, "হে মুসলমানরা! কার সাহস আছে আমার সঙ্গে লড়বে?" হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গী ৮ জনের সকলেই একে একে ঐ কাফির সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহীদ হেয়ে গেলেন। হযরত জুনাইদ সঙ্গীদের শাহাদাতের এই ঘটনাপ্রবাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, "এরা শহীদ হওয়ার সময় আমি উপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম ৯টি রূহবাহী খাট আকাশে ঝুলন্ত আছে। আমার সাথীরা একে একে শহীদ হলেন। সাথে সাথে তাদের রূহকে একেকটি খাটে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো। খালি থাকলো একটি খাট। ভাবলাম, নিশ্চয় এটি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

সুতরাং আমিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম। যে বীর যোদ্ধা আমার সাথীদেরকে শহীদ করেছিলো সে আমাকেও ডাক দিলো, ‘হে আবুল ক্বাসিম! ঐ নবম রূহ বহনকারী খাটটি আমার জন্য! আপনি বাগদাদে ফিরে যান। ইসলামের খিদমত করতে থাকুন। তবে যাওয়ার পূর্বে আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন!’”

তিনি আরো বলেন, “সুতরাং ঐ বীর যোদ্ধা আমার হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর হাতের যে তরবারী দ্বারা আমার প্রিয় ৮ জন শাগরিদকে শহীদ করেছিলেন, সে-ই তরবারি দ্বারাই ৮ জন কাফিরকে হত্যা করলেন। এরপর তিনি নিজেই শহীদ গয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, সত্যিই তাঁর রূহটি ঐ অপেক্ষারত রূহবাহী খাটে তুলে নেওয়া হলো। এরপর উর্ধ্বাকাশের দিকে সবগুলো খাট এ নয়জন শহীদের লাশ নিয়ে আরোহণ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো।”

৪. মা’রিফাতের স্তর: একদা হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ দজলা নদীর তীরে আসলেন। ‘ইয়া আল্লাহ!’ বলে জিকির শুরু করলেন। এরপর তিনি পানির উপর দিয়ে হেটে নদী পার হয়ে গেলেন। নদী পার হওয়ার পূর্ব থেকে এক ব্যক্তি খেয়া নৌকার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন শায়খ জুনাইদ ‘ইয়া আল্লাহ!’ জিকির করে করে পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে যাচ্ছেন, তখন তিনিও অগ্রসর হলেন, বললেন, “ইয়া শায়খ! আমিও নদী পার হবো।”

শায়খ জুনাইদ তাকে বললেন, “ইয়া জুনাইদ! ইয়া জুনাইদ! বলতে বলতে আমাকে অনুসরণ করো।”

ঐ ব্যক্তি তা-ই করলেন ও পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকেন। নদীর মাঝখানে পৌঁছুনোর পর শয়তান এসে তাকে ওয়াসওয়াসা দিলো। বললো, “কে বড়ো, আল্লাহ না শায়খ জুনাইদ? শায়খ নিজেই বলছেন, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! কিন্তু তোমাকে নির্দেশ দিলেন ইয়া জুনাইদ! ইয়া জুনাইদ! বলতে। এটা তো শিরক! এটা বলা বন্ধ করো। বলো, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!”

শয়তানের এ ওয়াসওয়াসায় তিনি বিভ্রান্ত হলেন। তাকে অনুসরণ করে বলতে লাগলেন, “ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ!” সাথে সাথে তিনি পানিতে নিমজ্জিত হলেন। চিৎকার দিলেন, ‘বাচাঁও! বাঁচাও!’

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ পেছন ফিরে বললেন, “আমার নির্দেশ মতো বলো, ইয়া জুনাইদ! ইয়া জুনাইদ!” লোকটি তাই করলেন। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, তিনি ভেসে ওঠেছেন ও পানির উপর দিয়ে পুনরায় হাঁটতে পারছেন। এরপর উভয়ে নিরাপদে নদীর ওপর পারে উপনীত হলেন।

লোকটি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে ঘটনার রহস্য কী জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “হে শায়খ! আমি এর রহস্য বুঝতে পারলাম না। আপনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! এবং নিরাপদে নদী পার হলেন। আর আমি যখন তাঁর [সুবহানাহু তাআলা] নাম উচ্চারণ করলাম, তখন তলিয়ে যেতে থাকি নদীর পানিতে। এর কারণ কী?”

হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “হে বোকা! তুমি এখনও জুনাইদকেই চিনতে পারো নি, অথচ স্বয়ং আল্লাহকে চেনার [মা’রিফাতুল্লাহর] স্বপ্ন দেখছো!”[৪৫]

হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৩৪ হি.)

১. ডুমুর ভক্ষণ না করার কারণ: হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেন, “আমি নিজে নিজে প্রতিজ্ঞা করলাম- কখনও কিছু ভক্ষণ করবো না, যদি না তা হালাল হয়। অর্থাৎ, হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত না হয়ে খাবো না। এরপর একদিন একটি ডুমুর বৃক্ষের নিচে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করি। আগ্রহ জন্মালো ডুমুর খাবো। গাছ থেকে একটি ডুমুর পেড়ে আনলাম। যে মুহূর্তে এটি মুখে দেবো

---

[৪৫] এখানে ভুলবুঝাবুঝির অবকাশ নেই। মা’রিফাতের উচ্চস্তরে আরোহণকৃত হযরত শায়খ জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ যখন ইসমে যাতের জিকির করছিলেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে মুশাহাদার [আল্লাহ তা’আলার উপস্থিতির] স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর এ জিকির ও অপর ব্যক্তির জিকিরের মধ্যে আধ্যাত্মিক দিক থেকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। বাস্তবে কারামতটি হযরত জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিলো আর এর প্রভাব পড়ছিলো অনুসরণকারী ব্যক্তির ওপর হযরতের ওয়াসিলায়। তাই তাকে ‘ইয়া জুনাইদ!’ বলার অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ তোমার ওলি জুনাইদের ওয়াসিলায় আমাকেও পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়ার ক্ষমতা দান করুন। এরূপ করা মোটেই শিরকের অন্তর্ভুক্ত আমল নয়, যা মরদূদ শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছিলো। -গ্রন্থকার।

তখনই এক আওয়াজ শ্রুতিগোচর হলো: "হে আবু বকর! আমাকে ভক্ষণ করো না। তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে যাবে। আমার গাছের মালিক একজন ইয়াহুদী!"

২. মজযুব বেশে হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহ: একদিন তিনি সব স্থানে 'আল্লাহ' নাম লিখতে লাগলেন। হঠাৎ একটি গায়েবি আওয়াজ শুনলেন: "তুমি কতোক্ষণ নাম নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? তুমি যদি সত্যিকার অন্বেষী হয়ে থাকো, তাহলে ঐ নামের মালিককে আপন করে নিতে অগ্রসর হও!"

এ কথাগুলো তাঁকে গভীরভাবে ভাবান্বিত করে তুললো। প্রচণ্ড আঘাত হানলো তাঁর অন্তরাত্মায়। সান্ত্বনা ও স্থিতি তাঁর মধ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। তাঁর মধ্যে আল্লাহপ্রেমের ছোঁয়া এতোই গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেলো যে, তিনি আধ্যাত্মিক সংক্ষোভে একেবারে কাঁপতে থাকেন। তাঁর তনু-মন-দেহ থেকে স্বাভাবিকতা বিলুপ্ত হয়ে গেলো। লেগে গেছে অন্তরে অসীমের প্রেমাগ্নি। রোমাঞ্চকর অনুভূতি হেতু তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে ছুটে চললেন। নিজেকে শেষ করতে হবে! চিরতরে ধ্বংস করে দিতে হবে!

অন্তর্জ্বালা সইতে না পেরে ছুটে চললেন দজলা নদীর দিকে। লাফ মেরে পড়ে গেলেন নদীর পানিতে। কিন্তু বিধি বাম, নদীর পানিও তাঁকে গ্রহণ করলো না। একটি ঢেউ এসে তাঁকে তীরে তুলে দিলো। তিনি ছুটতে থাকেন। জ্বলন্ত অগ্নিতে নিজের দেহকে পুড়িয়ে ফেলতে নিমজ্জিত হলেন। কিন্তু হায়! অগ্নিও তাঁকে দগ্ধ করলো না। তিনি ছুটতে থাকেন, চলে গেলেন জঙ্গলে, যেখানে হিংস্র সিংহরা বাস করে। তিনি এদের সম্মুখে যেয়ে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, এরা এখন আমাকে শেষ কবরে। কিন্তু একী! সকল সিংহ তাঁকে দেখে পালিয়ে গেলো! কোথায় যাবেন একটুকু সান্ত্বনা পেতে? ছুটে গেলেন এক পাহাড়ের পাদদেশে। দ্রুত আরোহণ করলেন একেবারে শৃঙ্গে। লাফ মেরে পড়ে গেলেন নিচের দিকে! কিন্তু কোত্থেকে প্রচণ্ড বাতাসের এক কুণ্ডলী এসে তাঁকে আকাশে তুলে ভাসাতে থাকে। এরপর ধীর ধীরে জমিনে রেখে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁর উদ্বিগ্নতা বেড়ে গেলো হাজার গুণ।

চিৎকার দিলেন, "হে আবু বকর! তোমার প্রতি চরম ধিক্কার! তোমাকে না গ্রহণ করে পানি, অগ্নি, হিংস্র জন্তু কিংবা পাহাড়!"

কর্ণগোচর হলো এক অপূর্ব গায়েবী আওয়াজ, "যাকে আল্লাহ গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাকে আর কেউ গ্রহণ করতে পারে না!"

কিছু লোকজন ছুটে আসলো। তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো পাগলাগারদে! চিৎকার দিলো সকলে, "এ ব্যক্তি পাগল!"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের চোখে আমি অবশ্যই পাগল আর তোমরা সবাই প্রকৃতিস্থ। আমার প্রভু আমার পাগলামী আরো বৃদ্ধি করুন এবং তোমাদের প্রকৃতিস্থকে বাড়িয়ে দিন। এ পাগলামী হেতু আমি যেনো আরো কাছে থেকে কাছে চলে যাই তাঁর। আর তোমরা সবাই প্রকৃতিস্থ হেতু চলে যাও তাঁর দূর থেকে দূরে!"

এরপর খলিফা তাঁর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করেন। লোকজন এসে বলপূর্বক তাঁর মুখের ভেতর ঔষধ ঢুকিয়ে গলদ্ধকরণ করায়। তিনি চিৎকার দিলেন: "তোমরা কেনো এমনভাবে এতো কষ্ট করছো? এ রোগ তো এমন নয় যে, কোনো ঔষধ দ্বারা নিরাময় হবে!"[৪৬]

৩. ঘুঘুর সাথে জিকির: একদা হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ একনাগাড়ে ৭দিন যাবৎ একটি বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে 'হু! হু!' করে জিকির করেন।

তাঁর বন্ধুরা প্রশ্ন করলেন, "এ তুমি কী করছো আবু বকর?"

তিনি জবাবে বললেন, "ঐখানে দেখো ঘুঘুটি কী সুন্দর বলছে, কূ! কূ! আর আমি তার সাথে তাল মিলিয়ে বলছি, হু! হু!" সবাই লক্ষ্য করলো, ঘুঘুটি তখন পর্যন্ত ডাক থামায় নি যতক্ষণ না শিবলী রাহিমাহুল্লাহ জিকির থামালেন।

৪. মৃত্যুকালীন অবস্থা: হযরত খুলদি বর্ণনা করেন, "আমি হযরতের খাদিম বাকরামকে প্রশ্ন করলাম, 'তাঁর মৃত্যুকালীন অবস্থা কী ছিলো?' তিনি জবাব দেন, 'তিনি আমাকে বললেন, "হে বাকরাম! আমার এক দিরহাম ঋণ অপরিশোধিত

---

[৪৬] হযরত ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ, "তাজকিরাতুল আউলিয়া"- হযরত আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহর জীবনী অধ্যায়।

ছিলো, মালিককে না পেয়ে পরিশোধ করতে পারি নি। এর বদলে আমি এক হাজার দিরহাম সাদক্বা করেছি ঐ ব্যক্তির নামে। এ মুহূর্তে এ ব্যাপারটি ছাড়া আমার অন্তরে আর কোনো ভাবনা নেই।”

এরপর তিনি পুনরায় বললেন, “হে বাকরাম! আমাকে ওযু কিরিয়ে দাও। নামায আদায় করবো।” আমি ওযু করালাম, তবে তাঁর দাড়ি খিলাল করতে ভুলে গেলাম। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। আমার হাতে ধরে তা দাড়ির উপর রাখলেন। এরপরই তিনি এ মায়াবী ধরার কোল থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর চিরকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদের নিকট চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।’”

এরপর হযরত খুলদি রাহিমাহুল্লাহ কাঁদতে লাগলেন। বললেন, “আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলবেন, যিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও শরীয়তের একটি আদবের খেলাফ পর্যন্ত করেন নি?”

হযরত শিবলী রাহিমাহুল্লাহর খাদিম বাকরাম আরো বলেন, “জিলহাজ্জ মাসের শেষ শুক্রবার শায়খী শরীরের ব্যথা হেতু কিছু পাতলা অনুভব করেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা কী [জুমুআ’র নামায আদায়ের জন্য] মসজিদে যাবো?” জবাব দিলাম, “হ্যাঁ।” তিনি আমার কাঁধের ওপর ভর করে মসজিদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। আমরা যখন অনুলেখদের ইমারতের নিকট আসি তখন একব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। হযরত তাকে বললেন, “আগামীকাল শায়খের সাথে সাক্ষাৎ করবো। কিছু কাজ আছে।” নামায শেষে আমরা ঘরে ফিরে আসি। তিনি পরের দিন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়লেন। এদিন দিবাগত রাতই তাঁর মৃত্যু হয়। আমাকে বলা হলো, ‘এই এই স্থানে একজন উচ্চ পর্যায়ের ওলি বাস করেন। তিনি লাশের গোসল দেন।’

আমি ভোর হওয়ার পূর্বেই লাশের গোসল প্রদানকারী ওলিআল্লাহর ঘরের দরোজার সামনে যেয়ে কড়া নাড়লাম। ভেতর থেকে তিনি বললেন, “আবু বকর শিবলীর মৃত্যু হয়েছে, তাই না?” আমি অবাক হয়ে জবাব দিলাম, “জী ... হযরত! তিনি বিদায় হয়েছেন।” তিনি বাইরে আসলেন। আমি এবার আরো আশ্চর্য হলাম, তিনিই তো গতকালে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিলো, সে-ই শায়খ! আমি বলে

উঠলাম, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! কী বিরাট বিস্ময়!" এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "রাতের গভীরে যাঁর উপাসনা করেন তাঁর কসম! আপনি কীভাবে জানলেন, হযরত শিবলী ইন্তিকাল করেছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "নির্বোধ কোথাকার! শিবলী রাহিমাহুল্লাহর আর কী কাজ থাকতে পারে আমার সাথে? তিনি কী গতকাল জুমুআ নামাযে যাওয়ার পূর্বে আমাকে বলেন নি, আগামীকাল আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন, কিছু কাজ আছে?"

হযরত বিশর হাফী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২২৬ হি.)

১. একটি উত্তম কাজেন বিনিময়: বিশর হাফী রাহিমাহুল্লাহ প্রাথমিক জীবনে একজন মদ্যপ ছিলেন। মদের বারে যেয়ে মদ পান করে মাতাল অবস্থায় পড়ে থাকতেন। একদা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন নগ্নপায়ী (হাফী) বিশর। তিনি দেখতে পেলেন এক টুকরো কাগজ রাস্তার ওপর পড়ে আছে। এতে আরবিতে লিখা ছিলো "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। তিনি এটি আদবের সাথে তুলে নিয়ে চোখের মধ্যে ঘষলেন, চুমু খেলেন। কাগজ টুকরোয় আতর লাগিয়ে কক্ষের উঁচু একটি স্থানে রেখে দিলেন।

সেদিন রাতেও বিশর হাফী মদের বারে যেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হলেন। এদিকে সমসাময়িক মাশাইখ হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ গায়েবি নির্দেশনা পেলেন: "যাও! বিশর হাফিকে মদের বার থেকে নিয়ে আসো!" এ নির্দেশ পেয়ে হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ মদের বারে গেলেন।

বারে উপস্থিত মদ্যপগণ মহাত্মন হাসান রাহিমাহুল্লাহকে দেখে অবাক হয়ে গেলো। ভাব বুঝে তিনি সবাইকে অবগত করলেন, "আমি এসেছি বিশরকে নিয়ে যেতে। তিনি কোথায়?" একজন বললো, "ঐ দেখুন, বিশর মদ পান করে মাতাল অবস্থায় পড়ে আছেন।" হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বিশরকে কোনোমতে বার থেকে বের করে নিয়ে আসলেন।

বিশরের হুঁশ ফিরে আসার পর শায়খ হাসান বললেন, "আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে আমি তোমাকে মদের বার থেকে নিয়ে এসেছি।" এরপর এক গায়েবি

আওয়াজ শুনা গেলো, "হে বিশর! তুমি আমার নামকে সম্মান করেছো। আমি খুশি হয়ে তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলাম। তুমি আমার নামকে আতর দ্বারা সুগন্ধিযুক্ত করেছো। এর বদলে আমি তোমার গুনাসমূহ মুছে দিয়ে তোমাকে পবিত্র করলাম ও আমার সুগন্ধি দ্বারা তোমার অন্তরাত্মা ভরে দিলাম।"

২. মুত্যুর পরের অবস্থা: হযরত বিশর হাফী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর একব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করলেন?" তিনি জবাব দিলেন, "প্রভু আমাকে প্রশ্ন করলেন, হে হাফী! জীবিত থাকতে তুমি কোন কারণে আমাকে এতো বেশি ভয় করতে? তুমি কী জানতে না, আমি কতো মেহেরবান ও ক্ষমাকারী? এখন তুমি সুপেয় পানীয় পান করো ও সুস্বাদু খাবার খাও- কারণ জীবিত থাকতে তুমি এতো বেশি উপবাস (নফল রোযা) করেছো।"

হযরত যুননুন মিসরী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪৫ বা ২৪৬ হি.)

১. **ঔষধ থেকে মণি:** একদা একদল দরবেশ কয়েকদিন একনাগাড়ে না খেয়ে থাকার পর বেশ দুর্বল হলেন। এক বালক এসে হযরত যুননুন মিসরী রাহিমাহুল্লাহকে বিষয়টি অবগত করলো। তিনি তাকে বললেন, "এই নাও ৩ দিনার। এগুলো দিয়ে ঔষধের দোকান থেকে এই-এই ঔষধ ক্রয় করে নিয়ে আসো।"

বালক ঔষধ নিয়ে ফিরে আসার পর হযরত যুননুন বললেন এগুলো গুড়া করো ও তৈল মিশিয়ে কয়েকটি বল বানাও। বালক তাই করলো। তিনি বললেন, এবার সূচ দ্বারা এগুলোর মধ্যে একটি করে ছিদ্র করো। বালক তা-ই করার পর তিনি বলগুলো হাতে তুলে নিলেন। হাতের মুষ্ঠিতে সবগুলো বল ঘর্ষন করলেন। এরপর সবগুলোর উপর ফুৎকার দিলেন। আল্লাহর কী কুদরত! সবগুলো বল পদ্মরাগমণিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলো।

তিনি বালককে বললেন এগুলো নিয়ে বাজারে যাও। মানুষ কতটুকু পর্যন্ত দাম করে জেনে এসো- একটিও বিক্রি করবে না। বাজারে নিয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেকটি

পদ্মরাগমণির দাম হলো এক হাজার দিনার! বালক ফিরে এসে সবকিছু বললো। হযরত যুননুন রাহিমাহুল্লাহ এবার বললেন সবগুলো গুড়ো করে দাও। বালক তা-ই করে ফিরে আসলো। তিনি বললেন, “এবার সবগুলো গুড়ো নদীতে ফেলে এসো।”

বালক ফিরে আসার পর হযরত যুননুন বললেন, “প্রিয় বৎস! ঐ দরবেশগণ আসলে খাবার না খেয়ে ভুখা হয় নি। বাস্তবে এটা তাদের স্বাধীন সিদ্ধান্ত।” বালক তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। তার মনে ভাবান্তর হলো। তাওবাহ করে সুলুকের রাস্তায় পাড়ি জমালো। দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে সম্পুর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।[৪৭]

২. চলন্ত খাট: এক চোখ নষ্ট আবু জাফর বর্ণনা করেন, একদিন আমি ও তাঁর একদল মুরিদ হযরতের (যুননুন মিসরী) সুহবতে ছিলাম। মুরিদগণ বস্তুসামগ্রীর চলন্ত হওয়ার কারামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। কক্ষের ভেতর একখানা খাট ছিলো যার ওপর কেউ বসা ছিলেন না। হযরত যুননুন মিশরী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “একটি উদাহরণ দেখা যাক কীভাবে ওলিদের নির্দেশে স্থির বস্তু চলতে পারে। যদি ঐ খাটকে বলি, কক্ষের চতুর্দিকে ঘুরে আসো!” কথা শেষ হতেই উক্ত খাটখানা নিজে নিজেই ঘুরতে শুরু করলো। চক্কর দিয়ে যখন এটি তার স্বস্থানে ফিরে আসলো তখন উপস্থিত এক যুবক চিৎকার দিয়ে কেঁদে ওঠলো ও মুহূর্তের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো! সবাই মিলে তাকে ঐ খাটেই গোসল দিয়ে কাফন-দাফন করলাম।[৪৮]

৩. মাটির টুকরো পরিণত হলো মূল্যবান পান্নায়: একদিন একব্যক্তি হযরত যুননুন মিসরী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে এসে আরজ করলো, হে মহাত্মন! আমি অত্যন্ত ঋণী। পরিশোধ করার কোনো ক্ষমতা আমার নেই। হযরত একখণ্ড মাটির টুকরো তার হাতে দিয়ে বললেন, এটি থলের ভেতর রাখো। বাজারে যেয়ে বের করে বিক্রি করে দিয়ো। যাও।”

---

[৪৭] তাযকিরাতুল আউলিয়া, শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ।

[৪৮] প্রাগুক্ত।

লোকটি বাজারে যেয়ে তলের ভেতর থেকে টুকরোটি বের করে দেখে এটি পরিণত হয়েছে মূল্যবান এক পান্নায়। সে চারশত দিনারে এটি বিক্রি করে ঋণমুক্ত হলো।[৪৯]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লার গোলাম

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের এক গোলাম ছিলো। তার মুক্তির জন্য হযরত মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “তুমি যদি ১০০ দিনার রুজি করে আমাকে দাও তাহলে তুমি মুক্ত হবে।”

এ প্রতিশ্রুতি পেয়ে গোলাম প্রত্যহ কিছু দিনার তার মালিকের হাতে দিতে থাকে। একদিন হযরত মুবারকের এক বন্ধু বললেন, “আপনি জানেন আপনার গোলাম কোত্থেকে দিনার পায়? সে প্রত্যহ কবরস্থানে যেয়ে মাটির নিচ থেকে লাশের কাফন চুরি করে বিক্রি করে।” আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এ সংবাদে অবাক হলেন। কারণ তাঁর গোলামটি ছিলো সৎ ও মুখলিস মানুষ। সে চুরি করবে- তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গোপনে গোলামের কবরস্থনে যাওয়া-আসা সচক্ষে দেখতে মনস্থ করলেন।

এক রাতে তিনি লুকিয়ে থেকে দেখলেন গোলাম ছেড়াবস্ত্র পরে কবরস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। সেখানে পৌঁছুয়ে সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দিলো। ফযরের নামাযের জন্য নিকটতম একটি মসজিদে প্রবেশ করলো। হযরত মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তাকে অনুসরণ করলেন। নামায শেষে গোলাম মুনাজাতের মধ্যে বললেন, “হে আল্লাহ! আজো আমি নিজের দেহপ্রভুর হাতে দিনার হস্তান্তর করতে হবে মুক্তির জন্য। আমাকে আজকের কাজের বিনিময় দান করুন।” দুআ শেষে একটি আলো উপর থেকে গোলামের হাতের মধ্যে পতিত হলো। এতে কয়েকটি দিনার ছিলো। গোলাম এবার দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে

---

[৪৯] প্রাগুক্ত।

মুবারক রাহিমাহুল্লাহ গোলামের সামনে যেয়ে বললেন, “আজ থেকে উভয়ে স্থান পরিবর্তন করলাম। তুমি হবে মালিক ও আমি হবো তোমার গোলাম!”[৫০]

হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহিমাহুল্লাহ

হযরত আবু ইসহাক শামী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘সাহেবে কারামত’ অলি ছিলেন। কেউ কোনদিন তাঁর সুহবতে আসার পর আর কখনও পাপকার্যে জড়িত হতে পারতো না। এটা ছিলো তাঁর এক প্রসিদ্ধ কারামত। এছাড়া তাঁর মজলিসে রোগীরা গমন করে আরোগ্য লাভ করতেন। ভ্রমণের সময় শতাধিক লোক তাঁর সফরসঙ্গী হতেন। কোনো কোনো সময় চোখ বন্ধ করে সবাইকে নিয়ে শত শত মাইলের রাস্তা ক্ষণকালের মধ্যে অতিক্রম করতেন।

একদা অনাবৃষ্টির কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এসময় দেশের বাদশাহ হযরত আবু ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে এসে আরজ করলেন, “হযরত! দেশবাসীর কল্যাণের জন্য আল্লাহর পবিত্র দরবারে দু’আ করুন”। তিনি হাত উত্তোলন করে দু’আ করলেন। সাথে সাথে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো। পরদিন বাদশাহ বেশ কিছু উপহারসামগ্রীসহ তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত আবু ইসহাক কাঁদতে লাগলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, “বার বার আমার এখানে দেশের বাদশাহের আগমন থেকে মনে হচ্ছে আমি কোনো বড় পাপ করেছি। কারণ ধনাঢ্যদের সঙ্গলাভের অর্থ গরীবদের সাথে সঙ্গলাভে হ্রাস হওয়া। আমি ভয় করছি, কি জানি- হয়তো আমার মৃত্যু গরীবদের বদলে ধনীদের সাথে হয়ে যায় কি না”।

[৫০] তাযকিরাতুল আউলিয়া -শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার রাহিমাহুল্লাহ।

হযরত আবু আহমদ আবদাল চিশতি রাহিমাহুল্লাহ

একদা তিনি একটি অ-মুসলিম সম্প্রদায়বহুল জনপদ অতিক্রম করছিলেন। এখানকার মানুষ মুসলমানদের উপর খুব বেশী ক্ষেপা ছিলো। এমনকি কারো সন্ধান পেলে তারা তাকে ধরে মারপিট করার পর অগ্নিকুণ্ডে ফেলে পুড়িয়ে দিতো। অত্র এলাকার চতুর্পাশ্বস্থ বহুদূর পর্যন্ত কোনো মুসলমানের বসতি ছিলো না। হযরত আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পেয়ে তারা রীতিমতো তাঁকে প্রহার করতে লাগলো। এরপর অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। কিন্তু তাঁকে ধরে সেখানে ফেলে দিতে সাহস পাচ্ছিলো না। ইতোমধ্যে কুণ্ডের মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু আহমদ আবদাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “আমাকে আপনারা জোর করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের প্রয়োজন নেই। আমি স্বেচ্ছায় অগ্নিতে পতিত হবো!” একথা শুনে সবাই অবাক হলো। এরপর তিনি সত্যিই একখানা মুসাল্লা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে নিজে লাফ মেরে পড়ে গেলেন। দেখা গেলে সাথে সাথে আগুন নিভে গেছে! কাফিররা এই অত্যাশ্চর্য কারামত অবলোকন করে সবাই কালিমা তায়্যিবাহ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ পাঠ করে মহাসত্যের ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল। কথিত আছে কয়েক শত লোক সেদিন হযরত আবদাল চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল।

আবু মুহাম্মদ আবদাল চিশতি রাহিমাহুল্লাহ

হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামতওয়ালা ওলিআল্লাহ ছিলেন। তাঁর জিকিরের হালত ছিলো অসাধারণ। একদা এক নদীর তীরে বসে তিনি নিজের ছেড়া চাদরখানা সেলাই করছিলেন। তাঁর কলব থেকে জিকিরের আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছিলো। এমন সময় দেশের বাদশাহ সেখানে এসে হাজির হলেন। হযরতের ফকিরী অবস্থা দেখে তার দয়া হলো- বললেন, হযরত এই থলেটি গ্রহণ করুন। থলেটি দীনারে পরিপূর্ণ ছিলো। হযরত আবু মুহাম্মদ বাদশাহের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে জবাব দিলেন, “বাদশাহর নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ আমাদের রীতি বিরুদ্ধ কাজ। সুতরাং আপনার টাকা আমি গ্রহণ করতে অপারগ। মাফ করুন।”

কিন্তু বাদশাহ নাছুড়বান্দাহ- হযরতকে তা গ্রহণের জন্য বার বার আবদার করছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত আবু মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর দৃষ্টি নদীর পানির দিকে নিক্ষেপ করলেন। দেখা গেল অসংখ্য মাছ ভেসে উঠেছে এবং প্রতিটির মুখে একেকটি স্বর্ণমুদ্রা শোভা পাচ্ছে! মৎসগুলো হযরতের দিকে সাঁতার কেটে চলে আসছিলো। বাদশাহ এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। হযরত আবু মুহাম্মদ বললেন, “হে আমার বাদশাহ নামদার! বলুন তো, যে ব্যক্তির নিকট এই বিরাট ধনভাণ্ডারের চাবি বিদ্যমান, তার কাছে আপনার এই থলেভর্তি দীনারের মূল্য কী-ই বা হতে পারে?”

বাদশাহ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসে রইলেন। এরপর দু’আ চেয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

হযরত আবু ইউসুফ চিশতি রাহিমাহুল্লাহ

একদা হযরত আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছু সঙ্গী-সাথীসহ অত্যন্ত গরম আবহাওয়ার মধ্যে কোথাও যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সবাই খুব তৃষ্ণাতুর হয়ে পড়লেন। সাথে যা পানি ছিলো তা ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আশেপাশে কোথাও পানির সন্ধান মিললো না। হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় যষ্টি দ্বারা মাটির উপর আঘাত করলেন। সুবহানাল্লাহ! দেখা গেল মাটি ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে! সবাই তৃপ্তিসহ পানি পান করলেন।

একদিন হযরত আবু ইউসুফ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক জনপদের উপর দিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে কোথাও ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি মসজিদের নিকট এসে দেখলেন অনেক লোকজন সেখানে জমায়েত আছে। তারা কী একটা সমস্যা নিয়ে বলাবলি করছিলো। হযরত ইউসুফ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, নির্মাণাধীন এই মসজিদের ছাদের জন্য একটি বীম তৈরী করে নিয়ে আসা হয়েছে। অথচ এটি যথেষ্ট লম্বা নয়। কেউই সমস্যাটির সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলো না। আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘোড়া থেকে নেমে মসজিদের ছাদের উপর উঠে গেলেন। এরপর ঐ বীমের একপ্রান্তে ধরলেন- এতে দেখা গেল

বীমের দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিটার পর্যন্ত বেড়ে গেছে! এই আশ্চর্য কারামত প্রত্যক্ষ করে সবাই একেবারে হতবাক হয়ে পড়লো। এরপর হযরত আবু ইউসুফ ছাদ থেকে নেমে নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করে গন্তব্য স্থানের দিকে চলে গেলেন।

হযরত মওদূদ চিশতি রাহিমাহুল্লাহ

হযরত মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি বিশেষ কারামত ছিলো। তিনি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারতেন। হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাঁর রচিত 'মাশাইখে চিশত' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি ছিলেন 'তাই'উল আরদ্ব' অর্থাৎ ক্ষণকালে পৃথিবীর জমিনের উপর চলতে পারতেন। একদা তিনি তাওয়াফের উদ্দেশ্যে সুদূর মক্কা মুকাররমায় ক্ষণকালের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন।

হযরত মাওদূদ চিশতির হালের অবস্থা ছিলো উচ্চ পর্যায়ের। তিনি ছিলেন সাহেবে কাশফ (হৃদয়নেত্র উন্মুক্ত)। তাঁর কাশফের মাক্বামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো 'কাশফে কুলুব' তথা হৃদয়ের উন্মোচন এবং 'কাশফে কুবুর' তথা কবরের অবস্থার উন্মোচন। একদা এক শাহজাদা তাঁর দরবারে এসে হাজির হলেন। বললেন, হযরত! অনুগ্রহ করে কিছু তাবাররুক প্রদান করে আমাকে ধন্য করুন। কিন্তু খাজা সাহেব জবাব দিলেন, তা দেওয়া সম্ভব নয়। শাহজাদা হযরতের কিছু ঘনিষ্ঠজনদের মাধ্যমে সুপারিশ করিয়ে তাবাররুক নেওয়ার চেষ্টা করলেন। অবশেষে তিনি তাকে একটি টুপি উপহার দিলেন। তবে প্রদানের সময় বললেন, "এই টুপিটিকে তুমি সযত্নে মাথায় পরে এর সদ-ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবে- অন্যথায় সমস্যা হবে!"।

ফেরার পথে শাহজাদা এই টুপি নিয়ে তামাশায় লিপ্ত হলেন। এটাকে মাথায় না পরে তিনি তার জাগতিক কার্যাদিতে মগ্ন হলেন। হযরত মাওদূদ চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সংবাদ পেয়ে বললেন, "কি হলো, টুপি কি তার কার্য থেকে বিরত রয়েছে?" মাত্র ক'দিন পর দেখা গেলো, ঐ শাহজাদাকে কর্তৃপক্ষ বড়

একটি অপরাধের দরুন গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। এরপর শাস্তি হিসাবে তার চোখদ্বয় উপড়ে ফেলা হলো।

হযরত উসমান হারুনী রাহিমাহুল্লাহ

একদিন তিনি কোনো এক জনপদের উপর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ছিলো অগ্নিপূজক। শহরের একটি জায়গায় অনেক লোক জমায়েত হলো। সেখানে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত ছিলো। হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অদূরেই তাঁবু টাঙ্গিয়ে অবস্থান করছিলেন। খাবার তৈরীর লক্ষ্যে উনুনে আগুন দিতে হবে। কিন্তু কোথাও ম্যাচ খুঁজে পেলেন না। খাদিমকে ডেকে হযরত ঐ অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুন নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। খাদিম সেখানে পৌঁছে উপস্থিত এক ব্যক্তিকে বললো, ‘আমি হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন খাদিম। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এই অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুন নিয়ে যাবো। দয়া করে তা নিতে অনুমতি দিন।’ লোকটি অবাক হয়ে খাদিমের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, ‘তুমি কী বলছো? তুমি জানো না, এই আগুনকে আমরা উপাসনা করি! এই অগ্নি পবিত্র! এ থেকে আগুন দেওয়া নিষিদ্ধ’। খাদিম ফিরে এসে সব কথা হযরতের নিকট বর্ণনা করলো।

এরপর হযরত উসমান হারুনী নিজেই সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকট যেয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি অগ্নিকুণ্ডের কাছে উপস্থিত শত শত লোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, “দেখুন ভাইসব! একমাত্র আল্লাহ তা’আলাই উপাসনার যোগ্য। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এই অগ্নি মোটেই উপাসনার যোগ্য নয়- কারণ, এটারও সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তা’আলা। আপনারা এই অগ্নিকে মা’বুদ বানিয়ে মারাত্মক পাপ করছেন, যার ফলে এই আগুন দ্বারাই মহান প্রতিপালক জাহান্নামে আপনাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে কঠোর শাস্তি দেবেন। কিন্তু এই আগুনের উপাসনা থেকে যদি বিরত থাকেন, তাহলে রোজ কিয়ামতে আপনাদেরকে আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুনে পুড়ানো থেকে রেহাই দিতে পারেন।”

হযরতের বক্তব্য শ্রবণ করার পর উপস্থিত অগ্নিপূজকদের নেতা এগিয়ে এসে বললো: 'হে সুফি সাহেব! আপনি তো বললেন আগুনকে উপাসনা করেন না। আর এর ফলে জাহান্নামের আগুন আপনাকে স্পর্শ করবে না। তাহলে, দয়া করে এর প্রমাণ এক্ষুণি প্রদান করুন: এই আগুনের মধ্যে পতিত হয়ে দেখিয়ে দিন তো আপনার কথা সত্য কি না! যদি আপনি পুড়ে মরে না যান, তবেই বুঝবো আপনি সত্যবাদী!"

হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ক্ষণকাল চোখ বন্ধ করে আল্লাহর দিকে নিজেকে রুজু করে নিলেন। তারপর দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন। ঐ নেতার ছোট্ট একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে অগ্নিকুণ্ডে লাফ মেরে পড়ে গেলেন! উপস্থিত সবাই ভাবলো, হায়! দরবেশ ব্যাটা নিজে তো মরলো, সাথে সাথে আমাদের নেতার বাচ্চাটিও খোয়া গেল! কিন্তু দীর্ঘ দু' ঘণ্টা পর দেখা গেলো হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাচ্চাসহ অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে আসছেন হাসিমুখে। তাঁর এবং বাচ্চার শরীরের একটি লোমও পুড়ে নি! সুবহানাল্লাহ! উপস্থিত শত শত অগ্নিপূজক তাজ্জব হয়ে গেলো! তাদের মনে ভীষণ ভাবান্তরের সৃষ্টি হলো। তারা ভাবলো, হায়! সারা জীবন অগ্নির পূজা করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি নষ্ট করে ফেলেছি! এখন উপায়? সবাই লুটে পড়লো হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পায়। বললো, হুজুর! আমাদেরকে কালিমা শাহাদাত পাঠ করান! আমরা একমাত্র সত্যধর্ম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবো। সুবহানাল্লাহ! এদিনই শত শত মুশরিক হযরতের হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো এবং পরে এই ঘটনা জানাজানির পর আরো হাজার হাজার মানুষ মুসলমান হয়ে নিজেদের জীবনকে ধন্য করলো। হযরত জাকারিয়া কান্ধলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এই কারামতটি ছিলো 'ইব্রাহিমী মু'জিযা' স্বরূপ। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্সালাম নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়েও আল্লাহর হুকুমে বেঁচে গিয়েছিলেন। আগুন তাঁর একটি লোমও স্পর্শ করে নি- তার জন্য তা, শীতল ও আরামদায়ক হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

-"আমি বললাম: হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" [সূরা আম্বিয়া : ৬৯]

এদিকে অগ্নিকুণ্ডে যে ছেলেটি হযরতের সঙ্গী ছিলো তার নেতৃস্থানীয় পিতা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর 'অবদুল্লাহ' ও ছেলে 'ইব্রাহীম' নামে পরিচিত হলেন। উভয়ে হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সান্নিধ্যে থেকে পরবর্তীতে নেককার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন।

উপরে বর্ণিত প্রসিদ্ধ কারামতটি ছাড়াও হযরত উসমান হারুনীর আরো এক দু'টো কারামতের বর্ণনা বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। এর ক'টির বর্ণনাকারী হচ্ছেন গরীবে নিওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন আজমিরী চিশতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলেন: একদা আমি হযরতের খাদিম হিসাবে সফরসঙ্গী হলাম। আমরা একটি নদীর পারে এসে দেখলাম পারাপারের কোনো খেয়া নৌকো নেই। কিন্তু অপর পারে আমাদেরকে যেতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন খেয়া নৌকো এলো না তখন হযরত আমাকে নির্দেশ দিলেন, চোখ দু'টো বন্ধ করো। আমার নির্দেশ ছাড়া আবার খুলবে না।' আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। চোখ খোলে দেখি আমরা নদীর অপর পারে এসে পৌঁছে গেছি!

একব্যক্তি হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হয়ে আবদার করলো, হযরত! আজ বেশ কিছুদিন হয় আমার ছেলেটি হারিয়ে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার কোন সন্ধান মিলে নি। দয়া করে দু'আ করুন- যাতে আমার হারানো মানিককে পেয়ে যাই। হযরত লোকটির কথা শ্রবণ করে কিছুক্ষণের জন্য মুরাক্বাবা করলেন। এরপর বললেন, "আপনার ছেলে তো বাড়িতে এসে গেছে!"

হযরতের উক্তি শ্রবণ করে তাড়াতাড়ি সে তার বাড়িতে চলে আসলো। ছেলের আগমন সত্যিই হয়েছে দেখে সে একেবারে অবাক! কাল বিলম্ব না করে সে ছেলেকে নিয়ে হযরত উসমান হারুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হলো। অত্যন্ত বিনয়ভাবে হযরতকে ধন্যবাদ জানালো। ছেলেকে হযরত জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছিল বাবা? উত্তরে সে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করলো।

সে বললো, "আমাকে একদল বণিক ধরে নিয়ে যায়। এরপর অনেক দূরের পথ ভ্রমণ শেষে অচেনা এক দ্বীপে নিয়ে আটক করে রাখে। সেখানে অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আজ ভোরে এক দরবেশ সেখানে হাজির হয়ে বললেন, 'ব্যাটা! আমাকে জড়িয়ে ধর, আমার পায়ের উপর তোর পা রাখ, এবার চোখ দু'টো বন্ধ করে নে।' আমি তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করলাম। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার বললেন, 'এবার চোখ খোলে ফেল'। কী আশ্চর্য, এবার দেখি আমি আমার বাড়িতে এসে গেছি!' ছেলের পিতা জিজ্ঞেস করলো, 'ঐ দরবেশের চেহারা কেমন, তা তোর মনে আছে?' ছেলে উত্তর দেওয়ার পূর্বে কিছুক্ষণ হযরত উসমান হারুনীর মুখপানে তাকালো, এরপর বললো, 'তিনি ছিলেন এই হযরতের মতো!'।

হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কিত অনেক কারামতের বর্ণনা বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়। 'মাশাইখে চিশত' এর লেখক তাঁর একটি কারামতের উল্লেখ করেছেন। দিল্লীতে থাকাকালে হযরতের স্ত্রী প্রায়ই তাঁদের পড়শী এক মহিলার কাছ থেকে টাকা-পয়সা, খাবার ইত্যাদি ধার করে নিয়ে আসতেন। কারণ, হযরতের ঘরে অনেক দিনই খাবার বলতেও কিছু থাকতো না। পড়শী মহিলার স্বামীর নাম ছিলো শরফুদ্দীন। একদা হযরতের স্ত্রী শরফুদ্দীনের স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু টাকা কর্জ আনলেন। এরপর আরেক দিন ঐ মহিলা কথায় কথায় হযরতের স্ত্রীকে বললেন, "আমি যদি আপনাদেরকে টাকা কর্জ না দিতাম তাহলে আপনারা ক্ষুদার জ্বালায় মরে যেতেন!"

এই মন্তব্যে তিনি অত্যন্ত কষ্টবোধ করলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই মহিলার কাছ থেকে আর কোন দিনই কিছু ধার করবো না। কিছুদিন পর ব্যাপারটি তিনি তাঁর স্বামী হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অবগত করেন। হযরত ক্ষণকাল নীরব থাকার পর বললেন, "এই মহিলার কাছ থেকে কিছু কর্জ আনা তোমার জন্য ঠিক হয় নি।" এরপর কক্ষের একটি তাকের দিকে ইশারা করে বললেন, "তুমি এখান থেকে প্রত্যহ যে পরিমাণ রুটির দরকার নিয়ে যেয়ো। যাকে ইচ্ছা তাকে তা বিতরণ করে দেবে।" এরপর থেকে হযরতের স্ত্রী অনেকদিন

যাবৎ উক্ত তাক থেকে তরতাজা রুটি নিয়ে যেতেন। এই রুটি কোত্থেকে যে আসতো, কেউ তা জানতো না। উল্লেখ্য, তুর্কী ভাষায় 'কাকী' শব্দের অর্থ হলো রুটি। হযরতের এ কারামত প্রকাশ হওয়ার পর থেকে তিনি 'কাকী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অবশ্য কাকী উপাধির পেছনে আরেকটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রসিদ্ধ খলিফা আমির খসরু একদা স্বীয় পীর সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, হযরত! আপনার মুর্শিদ হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিভাবে 'কাকী' নামে পরিচিত হলেন? তিনি জবাব দিলেন, "একদিন হযরত কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কয়েকজন সহচরসহ এক হাউজের পাশে বসা ছিলেন। কোনো একজন আক্ষেপ করে বললেন, আহ! এই প্রচণ্ড শীতের মাঝে যদি কোথাও থেকে খাবারের জন্য কিছু গরম 'কাকী' (রুটি) পাওয়া যেতো! একথা শ্রবণ করে হযরত কুতুবুদ্দীন হাউজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কিছু তরতাজা গরম রুটি নিয়ে আসলেন। সবাই তা তৃপ্তিসহ ভক্ষণ করলেন। এই কারামত প্রকাশের পর থেকেই তিনি 'কাকী' নামে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'সামা' (ইশকের কবিতা) খুব পছন্দ করতেন। তবে সামা সঙ্গীত শ্রবণ সবার জন্য বৈধ নয়। চিশতিয়া তরীকায় সামা শ্রবণের একটা ইতিহাস আছে। অবশ্য আধুনিক যুগের চিশতি বুজুর্গানে দীন ফিতনা থেকে রক্ষার্থে 'সামা' শ্রবণ থেকে বিরত থাকেন। হযরত বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আমলেও একদল সুফি-দরবেশ এবং বাহ্যিক আলিম-উলামা সামার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দিল্লীতে আগমন করে হযরত কুতুবুদ্দীন ও হযরত হামীদুদ্দীন নাগরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা খুব আগ্রহভরে সামা শুনতেন। এ খবর সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরীর (১১৯১-৯২) নিকট পৌঁছার পর তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তাঁরা 'সামা' শ্রবণ করছেন, এ কথাটি যদি আবার আমার কানে আসে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁদের লাশ আমি দরজায় টাঙ্গিয়ে দেবো! কিংবা কাজীদের আইনানুযায়ী তাদেরকে পুড়িয়ে মাটির মতো কালো করে ছাড়বো!"

হযরত কুতুবুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন সুলতানের এই নির্দেশ শ্রবণ করলেন তখন বললেন, "তিনি নিজে যদি নিরাপদে থাকেন, তাহলে আমাদের লাশ জ্বালাতে সক্ষম হবেন।" এ মাসেই শিহাবুদ্দীন ঘোরী খুরাসান প্রদেশে এক যুদ্ধে থাকাকালে বিশ্বাসঘাতক এক ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হন। (সিয়ারুস সালিকীন)

হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর

হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামতওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। বিভিন্ন কিতাবে তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত অনেক কারামতের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। কারামত বুজুর্গীর, ওলিয়াত কিংবা শায়খের যোগ্যতা লাভের প্রমাণ নয়। অধিকাংশ বুজুর্গানে দীনের মতে 'কারামত' মূলত তরীকতের রাস্তার 'কাটা' মাত্র। এ থেকে প্রত্যক্ষদর্শীরা হয়তো কিছু উপকৃত হতে পারেন, এই যা। যা হোক, হযরতের কারামত হিসাবে প্রসিদ্ধ পাঁচটি ঘটনা তুলে ধরছি।

১. ঘাতকের উদ্দেশ্য উপলব্ধি

লাহোরের প্রধান কাজি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী শায়খ ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বেশ হিংসার দৃষ্টিতে দেখতো। একদা তারা ফন্দি আঁটলো, তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। সুতরাং টাকার বিনিময়ে এক ঘাতককে হযরতের দরবারে প্রেরণ করলো। রাতের গভীরে হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গভীর ধ্যানমগ্ন আছেন। ঘাতক কক্ষে ঢুকে কর্কশ সুরে সালাম জানালো। মনে হলো তিনি তা শুনতে পান নি। সুতরাং জবাব দিলেন না। একটু পর তাঁর ধ্যান ভেঙ্গে গেলো। খাদিমকে বললেন, দেখো তো, আগন্তুক লোকটির গায়ে হলুদ বর্ণের জামা ও সে তুর্কী নিবাসী লোক কি না? খাদিম জবাব দিলেন, জি হ্যাঁ। তার কোমরে শিকল আছে, বস্ত্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছে একটি ছুরি, ঠিক কিনা? তুমি তাকে বলো, এই মুহূর্তে সে এখান থেকে বিদায় না হলে ভীষণ বিপদে পড়বে।

লোকটি আড়ালে থেকে সবই শোনতে পেলো। সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

২. পছন্দসই খাবার পরিবেশন

একদিন ৭ জন দরবেশ হযরতের খানক্বায় মেহমান হলেন। তারা সকলে মিলে হযরতের বুজুর্গী পরীক্ষা করার এক কৌশল আঁটলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ পছন্দসই খাবার কামনা করে বললেন, দেখি, সত্যিই আমাদের পছন্দসই খাবার সামনে এসে যায় কি না। কিছুক্ষণ পর তাদের সম্মুখে খাবার পরিবেশন করা হলো। বিভিন্ন জাতের ও নিজেদের পছন্দসই খাদ্য সামনে এসেছে দেখে দরবেশরা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব উচ্চ পর্যায়ের ওলি। তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেল।

৩. মুরীদ কর্তৃক স্বর্ণমুদ্রা লুকানোর ঘটনা

কোন এক সময় এক ধনী ব্যক্তি হযরতের এক মুরীদের মাধ্যমে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া হিসাবে পাঠালেন। মুরীদ জানতো, উক্ত ধনী লোকটি কখনো হযরতের দরবারে আসবে না। সুতরাং সে পথিমধ্যে সকলের অগোচরে ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা নিজের জন্য লুকিয়ে রাখলো। দরবারে পৌঁছে সে বাকী ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা হযরতের হাতে প্রদান করলো। তিনি মৃদু হেসে বললেন, "বৎস! তুমি তো বেশ সুন্দর অর্ধা-অর্ধিভাবে বণ্টন করলে!" কথাটি শুনতেই মুরিদের শরীরে কম্পন শুরু হয়ে গেল। সে বাকী মুদ্রাগুলো বের করে হযরতের হাতে তুলে দিয়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, ঘটনার পর কেনো যেনো এই মুরীদের প্রতি তিনি দয়াপরবশ হয়ে ওঠেন এবং নিজের সান্নিধ্যে রেখে দেন। পরবর্তীতে এই মুরীদ একজন খ্যাতিমান ওলি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

৪. হযরত বু-আলী কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ

একদা হযরত বু-আলী কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হযরত ফরিদুদ্দীন যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পার হতে হয়। কিন্তু সেখানে নৌকা ছিলো না। নদীর অপর পারে বু-আলী কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কুঁড়েঘর। ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একখানা ছোট্ট কাগজের নৌকা বানিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে এতে আরোহণ করলেন। আল্লাহর কুদরতে

নৌকোখানা তাঁকে নিয়ে অপর পারের দিকে চলতে লাগলো। এদিকে কুঠুরির জানালা দিয়ে মাথা বের করে বু-আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবকিছু অবলোকন করছিলেন। তিনি দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! নৌকোখানার গতিরোধ করুন!" সাথে সাথেই কাগুজে নৌকোটি থেমে গেলো নদীর মাঝখানে। হযরত ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে এটা ঘুরতে লাগলো। তিনি বিষয়টি বুঝতে পারলেন। চোখে পড়লো বু-আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জানালার মধ্য দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। হযরত ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ! বু-আলীর মাথায় দু'টি লম্বা শিং গঁজিয়ে দেন, যাতে তিনি এদিকে তাকাতে সক্ষম না হন!" এ দু'আও আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। সুতরাং বু-আলীর মাথায় শিং গঁজিয়ে ওঠায় জানালার বাইরে তাকাতে পারলেন না। ইতোমধ্যে ফরিদুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নদী পার হয়ে আসলেন। বু-আলী কলন্দর রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সালাম জানিয়ে কক্ষে ঢুকলেন। নিজের ভুল বুঝে বু-আলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মেহমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি ক্ষমা করলেন। সাথে সাথে বু-আলীর মাথা থেকে শিংদ্বয় অদৃশ্য হয়ে গেল। উভয় বুজুর্গ এবার মুসাফাহা করলেন।

৫. অপহৃতা স্ত্রী উদ্ধার

একদিন হযরতের খানক্বায় একব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করলো। বললো, "হযরত! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। একদল ডাকাত আমার ঘরে ঢুকে সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। আমি এতে সবর করেছি, কিন্তু তারা আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকেও অপহরণ করে নিয়ে গেছে! দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। আমার স্ত্রী ছাড়া আমি বাঁচবো না।" শায়খ ফরিদুদ্দীন একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা তুমি আগামীকাল এসো। দেখি কিছু করা যায় কি না। পরদিন সে ফিরে আসার পর তিনি বললেন, এখানে একটু অপেক্ষা করো। বাইরে দেখা গেলো একদল পুলিশ এক ব্যক্তিকে চেইন দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে সুলতানের দরবারে। তিনি লোকটিকে চিনতেন। সে বার বার আবদার করছিলো, "আমাকে ছেড়ে দিন! আমি কোনো অপরাধ করি নি। আমাকে অন্তত একটি বার শায়খ ফরিদুদ্দীনের দরবারে নিয়ে চলুন।"

পুলিশরা তার আবদার রক্ষার্থে হযরতের খানক্বায় নিয়ে আসলো। এ লোকটিও হযরতের নিকট আবদার করলো, “হে মহাত্মন! আপনি তো আমাকে চিনেন। আমি কোনো অপরাধ করি নি। দয়া করে আমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করুন।” তিনি জবাব দিলেন, “আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নেই। তুমি যদি নিরপরাধ হয়ে থাকো তাহলে ছাড়া পাবে। আমি দু'আ করছি।” নিজে লোকটির আমানতদার হয়ে পুলিশদেরকে বললেন, “এই লোকটিকে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিন।” পুলিশ তা মেনে নিল। এরপর হযরত অপর লোকটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, “যাও, এই লোকটিকে সাথে নিয়ে অমুক বাজারে চলে যাও। সেখানে দেখবে এক দাসীকে বিক্রি করা হচ্ছে। তাকে ক্রয় করে নিয়ে এসো।” উভয়ে বাজারে গিয়ে ঐ দাসীকে কিনে আনলো। খানক্বায় আসার পর হযরত বললেন, ওহে! স্ত্রীহারা ব্যক্তি! এই দাসীটি তুমি নিয়ে যাও। সে দাসীর মুখের নিকাব সরিয়ে অবাক হয়ে গেল। এযে তাঁরই অপহৃতা স্ত্রী! হযরত ফরিদুদ্দীন মাসউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এই অপূর্ব কারামতে সকলেই মুগ্ধ হলেন। বিপদে পতিত উভয় ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হলো।

হযরত শামসুদ্দি তুর্কী পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ

প্রায় আটশত বছর পূর্বে হযরত তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জীবিত ছিলেন। সে যুগের মহান মাশাইখ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের সাধনা ও ধ্যানের পথ-পাথেয়, পদ্ধতি ও মাত্রা ছিলো অতুলনীয়। আজকের যুগে এরূপ উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত, জিকির, মুরাক্বাবা, মুজাহাদাসম্পন্ন বুজুর্গদের সংখ্যা বিরল- এমনকি নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। ইলমে মা'রিফাতের রাস্তায় যখন সালিক খুব বেশী থেকে বেশী সাধনায় লিপ্ত হন তখন ‘পথের বস্তু’ হিসাবে ‘কাশফ’, ‘কারামত’ ও ‘ইলহাম’ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে কোনো সময় পরীক্ষা, অন্য সময় ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি আর অন্যান্য সময় অপর এক বা একাধিক বান্দার উপকারার্থে ভূষিত করেন। সুতরাং এসব ব্যাপার কোনো সালিকের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার নামই ‘কামালিয়াতের’ নিদর্শন নয়। জগতে অনেক আল্লাহর উচ্চপর্যায়ের ওলি ছিলেন যাদের মাধ্যমে এসব প্রকাশ পায় নি। তবে হযরত আলাউদ্দীন সাবির কালিয়ারী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য খলিফা হযরত শামসুদ্দীন তুর্কী পানিপথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কারামতওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন। সুতরাং তাঁর জীবনের অসংখ্য কারামত থেকে ক'টি মাত্র এখানে বর্ণিত হলো।

গরম অযুর পানি: তিনি একদা সিদ্ধান্ত নিলেন সুলতানের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবেন। ভীষণ ঠাণ্ডার মৌসুমে পুকুরের পানি পর্যন্ত বরফে পরিণত হতো। হযরতের এক সাথী একদিন এক ছোট্ট পুকুরের পারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন তিনি অযু করছেন। পানি হিমায়িত অবস্থায় ছিলো। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, অযুর পানিটুকু যে স্থান থেকে তিনি ওঠিয়ে নিয়ে কাজ সারছিলেন তা উত্তপ্ত। অর্থাৎ হযরতের অযুর জন্য এই কতটুকু জায়গার পানি শুধু তরল ছিলো না- গরমও হয়ে গিয়েছে! এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার উক্ত সৈন্য সুলতানকে অবগত করলেন। সুলতান হযরতের বুজুর্গি অনুধাবন করে তাঁর বিশেষ ভক্তে পরিণত হলেন।

দুর্গের দরোজা খুলে গেলো: দেশের সুলতান একটি দুর্গে কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করেও তা দখল করতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তিনি হযরত শামসুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হয়ে বললেন, "হযরত! অনুগ্রহ করে দু'আ করুন। আমি এই দুর্গটির উপর বার বার আক্রমণ চালিয়েও ব্যর্থ হচ্ছি।" প্রথমে তিনি কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু সুলতান বার বার আবদার করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি বললেন, "ঠিক আছে! আপনি নিজে আক্রমণ চালাবেন, দেখবেন এমনিতেই দুর্গের দরজা খুলে গেছে।"

সুলতান হযরতের কথা মতো দুর্গে আক্রমণ করলেন। সত্যিই এর দরজা খুলে গেল। তিনি অতি সহজে তা দখল করে দিলেন। এই ঘটনার পর হযরতের প্রতি সুলতানের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। কিন্তু শামসুদ্দীন তুর্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন লক্ষ্য করলেন, কারামতের ঘটনাবলী প্রকাশ হওয়ার পর লোকে তাঁকে অতিভক্তি করতে শুরু করেছে, তিনি গোপনে সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। এরূপ করার মূল কারণ ছিলো রিয়া ও যশ-খ্যাতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। সত্যিকার ওলিদের হালত এরূপই হয়ে থাকে। দুনিয়ার মানুষ তাঁদেরকে বড়ো ওলি ভাবুক, তা তাঁরা কখনো পছন্দ করতেন না।

হযরত আবদুল হাক রাদাওলাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ

কোনো এক দিন হযরত আবদুল হক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ বড়ো একটি পাতিলে খাবার তৈরী করে রাস্তার মধ্যে রেখে দিলেন। তিনি সবাইকে বললেন, “এই পাতিল থেকে লোকজন যতোই খাবার গ্রহণ করুক না কেনো, তা কমবে না ইনশাআল্লাহ!” সত্যিই তা-ই হলো। দীর্ঘ দিনব্যাপী পথিকরা উক্ত পাতিল থেকে খাবার খেলো কিন্তু তা কমলো না। আশ্চর্য এই কারামত অবলোকন করে লোকজন হযরতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। হঠাৎ তাঁর মনে এক ভাবের উদ্রেক হলো। মনে মনে বললেন, সর্বনাশ! এই কারামতের ফলে লোকজন তাঁকে অতিভক্তি করা শুরু করে দিয়েছে! এক্ষুণি তা না থামলে লোকজন ও তাঁর নিজের ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং তিনি সবাইকে বললেন, “কেউ ভুল বুঝবেন না। একমাত্র আল্লাহ তাআ’লাই হচ্ছেন রিজিকদাতা। যা হচ্ছে তা আল্লাহর হুকুমে হচ্ছে। একমাত্র তিনিই তাঁর সৃষ্ট সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমার কোনো হাত নেই।” একথা বলার পর পাতিলটি তিনি ভেঙ্গে ফেললেন।

হযরত আবদুল কুদ্দুস গঙ্গুগী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

‘জাওয়াহিরে খামশা’ নামক কিতাবের লেখক মুহাম্মদ গউস গোয়ালিয়ারী হযরত আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সমসাময়িক ছিলেন। তিনি জিন সাধন করতেন। একদা ইচ্ছা করলেন, হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিজের নিকট জিন মারফত নিয়ে আসতে। সুতরাং তিনি একজন জিনকে হযরতের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল কুদ্দুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসময় মসজিদে আল্লাহর জিকির করছিলেন। জিন তাঁর নিকটে যেয়ে কিছু বলার বা করার সাহস পাচ্ছিলেন না। হযরত হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘কে ওখানে?’।

জিন সামনে এগিয়ে যেয়ে সালাম জানালেন। এরপর বললেন, হযরত! মুহাম্মাদ গউস আমাকে পাঠিয়েছেন। তার ইচ্ছে আমি আপনাকে নিয়ে যাই। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। শূন্যের উপর তুলে আমি নিয়ে যাবো।

একথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে নির্দেশের সুরে বললেন, ‘হে জিন! তুমি এক্ষুণি গউসের নিকট যেয়ে তাকে আমার দরবারে নিয়ে আসো!’

জিন এই নির্দেশ পালন করতে গউসের নিকট গেলেন। তাকে ধরে শূন্যে উড়ো দিলেন। মুহাম্মদ গউস অবাক হয়ে নিজের সাধনকৃত জিনকে প্রশ্ন করলেন, ‘ওহে! এ কী করছো? তুমি আমাকে নিয়ে কোথায় চললে? আমার নির্দেশ অমান্য করলে কেন?’

জিন জবাব দিলেন, ‘অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই আপনার অনুগত। কিন্তু হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ক্ষেত্রে আমরা আপনার নির্দেশ পালনে অপারগ।”

সুতরাং মুহাম্মদ গউসকে হযরতের সম্মুখে নিয়ে হাজির করা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার লজ্জা হয় না?”

গউস সত্যিই লজ্জিত হলেন এবং হযরত গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বাইআত গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি ইলমে তাসাওউফের উচ্চতর মাক্বামে আরোহণ করেন। তিনি সাহেবে নিসবতের স্তরে উন্নীত হন। মুহাম্মদ গউসের সমাধি গোয়ালিওরে অবস্থিত।

হযরত জালালুদ্দীন তানেশ্বরী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত জালালুদ্দীন তানেশ্বরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক মুরীদ একবার বললেন, “এমন এক যুগ ছিলো যখন রূহানী জগতের উচ্চ পর্যায়ের ওলিদের চোখের দৃষ্টিপাত সাহেবে-কামাল হওয়ার কারণ হয়ে যেতো।” হযরত একথা শুনে বলে উঠলেন, “আজকের যুগেও এরূপ মহাত্মন ওলিআল্লাহ জীবিত আছেন!”

উক্ত মুরীদের প্রতি তিনি ক্ষণকালের জন্য গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করলেন। মুরীদ সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। দীর্ঘ তিনদিন পর্যন্ত তিনি এ অবস্থায় থাকলেন। এর কিছুদিন পর মুরীদ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তার মৃত্যুসংবাদ শুনে হযরত জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মন্তব্য করলেন:

"সকলের পক্ষে এই ওজন বহন করা সম্ভব নয়। এই ব্যক্তিও তা বহন করার ক্ষমতা রাখতো না।"

তানেশ্বর শহরে বাৎসরিক এক মেলা বসতো। শত-সহস্র হিন্দু এতে জড়োত হতেন। হযরত জালালুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদা তাঁর খাদিমকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মেলায় এতো হিন্দু জমায়েত হওয়ার কারণ কি? খাদিম তাঁকে বললেন, হযরত! এটা হিন্দুদের কি একটা ধর্মোৎসব। তবে এতে এক প্রখ্যাত যোগী আসেন। তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বিরাট। তিনি শক্ত যমিনের উপর ডুব দিয়ে মাটির নীচে যেতে পারেন এবং অন্য কোথাও যেয়ে আবার উঠে আসেন। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখার জন্যই এতো লোক একত্রিত হয়। হযরত বললেন, আমিও এই তামাশা দেখবো! আমাকে নিয়ে চলো। খাদিম কিছুটা আশ্চর্যবোধ করলো। এরপরও নির্দেশ মানতে হবে। হযরত তানেশ্বরী মেলায় গমন করলেন।

যোগী যে স্থানে তার 'অলৌকিত ক্ষমতা' প্রদর্শন করেন হযরতকে ঠিক সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। ক্ষমতা প্রদর্শনের সময় আসলো। যোগী প্রত্যেকবারের মতো এবারও মাটির উপর আঘাত করলেন। মাটি ফেটে গেল। তিনি লাফ মেরে ভেতরে প্রবেশ করলেন। সাথে সাথে হযরত জালালুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ স্থানে পা রাখলেন। যোগী আর বেরিয়ে আসলেন না, মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ

১. অগ্নিকাণ্ড: কোনো কারণবশত লাহুরীর পাঠান সম্প্রদায় হযরতের সঙ্গে অন্যায়ভাবে খারাপ ব্যবহার করে। এতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে লাহুরী ছেড়ে ঝানঝানায় চলে আসেন। ঐদিকে লাহুরী শহরের বিভিন্ন মহল্লায় অজানা কারণবশত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শুরু হলো। এতে মানুষের জান-মালের ক্ষতি হচ্ছিলো। কিন্তু কিছুতেই অগ্নিকাণ্ডের অবসান হলো না। স্থানীয় পাঠান সম্প্রদায় বুঝতে পারলো যে, হযরত ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সঙ্গে তাদের অন্যায় আচরণের ফলেই হয়তো এই বিপদ পুরো শহরে পতিত হয়েছে। তারা ছুটে গেল তাঁর দরবারে। ক্ষমা প্রার্থনা করলো। লাহুরীতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো।

হযরত ফিরে গেলেন। যেদিন তিনি লাহুরীতে ফিরে আসলেন এদিন থেকেই অগ্নিকাণ্ডের অবসান ঘটলো।

কিছুদিন পর পাঠান সম্প্রদায় তাঁর দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হযরত! আপনি লাহুরী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কোন্ কারণে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছিল? তিনি জবাব দিলেন, "আমি চলে যাওয়ার পর লাহুরী এবং এর অধিবাসীদের প্রতি আমার মুহাব্বতের কথা স্মরণ হয়েছে মাত্র, আর কিছু নয়।"

২. বৃষ্টিপাত: লাহুরী অঞ্চলে বেশ কিছুদিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছিলো না। লোকজন ছুটে এলো হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে। হযরত তখন একখণ্ড ইক্ষু চিবিয়ে রস আহরণ করছিলেন। আগন্তুকদের মধ্যে একব্যক্তির সঙ্গে হযরতের গভীর সম্পর্ক ছিলো। তিনি তাকে বললেন, "এই ইক্ষুখণ্ড যদি চিবিয়ে রস খাও, তাহলে আল্লাহ তা'আলা হয়তো বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন।" লোকটি ইতস্তত করতে লাগলেন। কিন্তু অন্যরা বললো, "হযরতের নির্দেশ পালন করো! চুষো!" তিনি শেষ পর্যন্ত ইক্ষুখণ্ড মুখে দিয়ে চুষতে লাগলেন। আল্লাহর কী করুণা! সাথে সাথে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেল।

৩. খামারে আগুন: কোনো এক সময় একটি খামারে আগুন ধরলো। হযরত নিকটস্থ কোথাও অবস্থান করছিলেন। খামারের মালিক ছুটে গেল হযরতের নিকট। বললো, হযরত! দু'আ করুন। আমার খামারটি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজের মাথার টুপি খুলে মালিকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এক্ষুণি ছুটে যাও। এই টুপি অগ্নিতে নিক্ষেপ করো!" খামারের মালিক ছুটে গেল এবং হযরতের নির্দেশ মুতাবিক টুপিটি অগ্নিতে ছুঁড়ে মারলো। সাথে সাথে আগুন নিভে গেল।

৪. অদৃশ্য হাতের কান ধরা: হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাজারে গেলে দোকানিরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতো এবং তাঁকে সালাম জানাতো। দোকানীদের মধ্যে প্রভাবশীল এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বললেন, আমরা কেনো এভাবে দাঁড়াবো? এরূপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে মতৈক্য সৃষ্টি করলেন। সুতরাং সবাই বললো, না, আমরা এভাবে আর দাঁড়াবো না।

পরদিন হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাজারে আসলেন। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, ঐ হিন্দু মহাজন সাহেবই তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন সবার আগে! এরপর একে একে অন্যান্য সকল হিন্দু-মুসলিম দোকানী দাঁড়ালেন। হযরত চলে যাওয়ার পর সকলে এসে ঐ প্রতিবাদী বাবুকে প্রশ্ন করলো, ব্যাপার কি? সবার পূর্বে আপনিই যে দাঁড়ালেন? তিনি জবাব দিলেন, "ভাইসব! দাঁড়ানো ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না। হযরত আসার সাথে সাথেই এক অদৃশ্য হাত আমার কান ধরে টেনে আমাকে দাঁড় করিয়েছে!"

৫. মিয়ান সাহেবের জিকিরের অবস্থা: একদা কারনাল থেকে একজন আলিম এসে মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে প্রশ্ন করলেন, "আমরা শুনতে পাচ্ছি, মানুষ বলাবলি করছে জিকিরের সময় নাকি আউলিয়াদের দেহের বিভিন্ন অংশ আলাদা হয়ে পড়ে? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?"

হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জবাব দিলেন, "এটা সম্ভব। আমার মামা বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা হযরত মিয়ান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খানক্বায় গিয়েছিলেন। খানক্বার দরজা বন্ধ ছিলো কিন্তু তালাবদ্ধ নয়। তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পেলেন। হযরত মিয়ান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দেহের বিভিন্ন অংশ তথা হাত, পা, মাথা ইত্যাদি আলাদা অবস্থায় আছে। ক্ষণকাল পরই হযরত মিয়ান সাহেবের অবস্থা স্বাভাবিক হলো। তিনি মামাকে বললেন, তুমি এইমাত্র যা দেখলে তা কারো নিকট বলবে না।"

৬. স্বর্ণের তৈরি দেওয়াল: এক সাধু হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট এসে বললো, "মিয়াজী! আমার ব্যাগে একটি পরশপাথর আছে। আপনি গরীব লোক। এটা গ্রহণ করুণ। এর দ্বারা আপনি ধনী হতে পারবেন।" তিনি জবাব দিলেন, "আমার ধনের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার পরশপাথর আপনার কাছেই থাকুক।" কিন্তু এটা গ্রহণ করার জন্য সাধু বার বার তাকে তাগিদ দিতে থাকেন। উভয়ে যে স্থানে দাঁড়ানো ছিলেন সেখানে একটি পুরাতন দেওয়াল ছিল। হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি মাটির ঢেলা হাতে তুলে সামনের ঐ দেওয়ালের উপর ছুঁড়ে মারলেন। এরপর বললেন, "সাধু! দেখুন তাকিয়ে!" সাধু অবাক হয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারণ, সমস্ত দেওয়ালটি স্বর্ণে

রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে! সাধু হযরতের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, "মিয়াজী! সত্যিই আপনি ধনী! এ পরশপাথর আপনার জন্য নয়।"

৭. হালের অবস্থা গোপন রাখা: হযরত নূর মুহাম্মদ ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেকে লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে খুব পারদর্শী ছিলেন। এ ব্যাপারে একটি অত্যাশ্চর্য অবস্থার কথা শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাইফিয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, "হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যে দীর্ঘ ৬ মাসব্যাপী একটি রূহানী হালের আত্মপ্রকাশ করে। এই একই হালের অবস্থায় উপনীত হয়ে হযরত মানসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আনাল হাক্ব' শব্দদ্বয় উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু হযরত মিয়াজী এই হালের অবস্থাকে এমনভাবে নিজের অভ্যন্তরে গোপন করে রাখলেন যে, আপন লোমকূপগুলোও এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারে নি। তিনি এই অবস্থায়ও বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষাদানসহ বাহ্যিক কাজকর্ম চালিয়ে গেলেন।"

৮. তাওয়াজ্জুর প্রভাব: কোনো একদিন একদল মুরীদ এসে হযরতকে আবদার জানালো, দয়াকরে আপনি আমাদের নফসের ইসলাহের ব্যবস্থা করুন। এসময় হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফের পাঠদান করছিলেন। মুরীদানের অনুরোধে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাচ্চাদেরকে বললেন, তোমরা তিলাওয়াত করতে থাকো। আমি একটু আসি। এরপর আবেদনকারীদের নিয়ে একটি কক্ষে ঢুকে পড়লেন। দরোজা বন্ধ করা হলো। হযরত মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবাইকে কাছে বসিয়ে তাওয়াজ্জুহ প্রদান করতে লাগলেন। বাচ্চাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ছেলেটি ভাবলো, হযরত ঐ কক্ষে কি করছেন একটু দেখে নিই। সে কক্ষের দরজার চাবিছিদ্র দিয়ে ভেতরে দৃষ্টিপাত করলো। সবকিছু দেখার পর ফিরে এসে অন্যান্য বাচ্চাদের নিয়ে বসে পড়লো। বললো, উস্তাদ হুজুর সেখানে কি করছেন আমি তোমাদেরকে দেখাবো? তারা বললো, দেখাও। সে বললো, এসো, সবাই চোখ বন্ধ করে আমার সামনে বসো! সব বাচ্চা সামনে বসার পর সে নিজে মিয়াজী সাহেব বনে গেলো এবং অভিনয় করে তাওয়াজ্জুহ প্রদানের বাহ্যিক কাজ দেখাতে অগ্রসর হলো। কিন্তু সে ভয় পেয়ে গেলো। সে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো।

পরিণত বয়সে তিনি বলেন, আমি যখন মিয়াজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাওয়াজ্জুহ প্রদান অবলোকন করছিলাম তখন অনুভব করলাম জ্বলন্ত আগুন আমার হৃদয়কে পুড়িয়ে ফেলছে! আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। এরপর হঠাৎ সেই আগুনের প্রভাব মুছে গেল। আজও সে-ই ছোটবেলার অভিজ্ঞতার প্রভাব থেকে আমি মুক্ত হতে পারি নি। অন্ধকার রাতে ঘরের ভেতর, শীতের সময় কম্বলে আবৃত আমার মুখমণ্ডল- তথাপি আমি শুনতে পাই বাইরের নিম গাছের প্রতিটি পাতার কম্পন।

৯. মর্যাদা: হযরত ঝানঝানাওয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর পর এক সাহেবে-কাশফ বুজুর্গ তাঁর কবর জিয়ারত করেন। পরে তিনি বললেন, "কোন্ যালিম তাঁকে এই স্থানে কবরস্থ করেছে? হযরত ইমাম সায়্যিদ মাহমুদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শ্রদ্ধাহেতু হযরতের নূরকে আটকে রেখে দিয়েছেন। তাঁকে যদি অন্যত্র কবর দেওয়া হতো তাহলে পুরো পৃথিবী তাঁর আনওয়ারের জ্যোতিতে নূরান্বিত হয়ে ওঠতো! ফিতনার সম্ভাবনা না থাকলে আমি তাঁর দেহ কবর থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে পুতে রাখতাম। এতে সকলে তাঁর নূর ও ফুয়ূজ দ্বারা উপকৃত হতো"।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

মক্কা শরীফে হিজরতের সময় পাঞ্জাশালাহে পৌঁছার পর হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাও আবদুল্লাহ খান নামক এক সুহৃদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এদিকে পুলিশ তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সে এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলো। খান সাহেব বললেন, হযরত! আমার ধারণা শীঘ্রই পুলিশ আসবে। আপনি আমার ঐ পরিত্যক্ত ঘোড়াশালে আত্মগোপন করুন। একদিন ঘোড়াশালের অন্ধকার একটি কামরায় তিনি ওযু সেরে চাশতের নামাযে মনোযোগী হলেন। মুসাল্লায় থাকাবস্থায় উপস্থিত প্রিয় ভক্তবৃন্দকে বললেন, আপনারা আপনাদের নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে নফল আদায় করে নিন। বিরাট ধনী রাও আবদুল্লাহ খান সাহেব ছিলেন হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্ত। হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামী। আর এরূপ ব্যক্তিকে

যে আশ্রয়দান করবে সে-ও আইনের চোখে রাষ্ট্রদ্রোহী। সুতরাং হযরতকে আশ্রয়দান করা ছিলো তার জন্য বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তিনি হযরতকে নামায অবস্থায় রেখে আস্তাবলের বাইরে এসে দাঁড়াতেই চোখে ভেসে আসলো একদল পুলিশ! হতবাক অবস্থায় থমকে দাঁড়ালেন রাও সাহেব। রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধে অভিযুক্ত হযরতকে আশ্রয় দিয়ে তার নিজের পরিণতি কী দাঁড়াতে পারে তা না ভেবে, হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিরাপত্তার চিন্তায় একেবাবে ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি জানতেন, পুলিশরা আস্তাবলের ভেতর তল্লাশী চালাবে। হায় হায়! এখন উপায়?

সত্যিই পুলিশ-বাহিনীর লোক আস্তাবলের দরোজার একেবারে সামনে দাঁড়ানো খান সাহেবের নিকট এসে গেল। তারা হাসিমুখে রাও সাহেবকে সালাম জানিয়ে অসময়ে এখানে আগমনের আসল কারণ একথা-সেকথা বলে গোপন রাখার চেষ্টা করলো। দূরদর্শী প্রজ্ঞাবান রাও সাহেব কিন্তু সবই অবগত ছিলেন। কোনো দুরাচার তার এখানে হাজী সাহেব আছেন বলে পুলিশকে খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই। পুলিশরা কোন্ কারণে এখানে এসেছে তা তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন। মনে মনে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, "হে আল্লাহ! মান-সম্মান, ধন-সম্পদ এমনকি জীবনের মালিক একমাত্র তুমি। আমি এই মুহূর্তে সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, এমনকি ফাঁসির কাষ্ঠে নিজেকে ঝুলিয়ে দিতেও আমি কোনো পরওয়া করি না। অনুগ্রহ করে তোমার ওলিকে এদের খপ্পর থেকে রক্ষা করো! হে আল্লাহ! আমার বাড়ি থেকে তিনি গ্রেফতার হলে আফসোসের শেষ থাকবে না, আমার জীবন-মরণ সমান হয়ে যাবে! হে প্রভু তুমি তোমার ওলিকে বাঁচাও!"

রাও আবদুল্লাহ খান জানতেন কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের পায়ে এই ইংরেজ বেনিয়াদের দেশীয় ধূসর পুলিশরা বেড়ি পরাবে। তবে নিজেকে সামলে নিতে হবে। তাই তিনি খুব শান্তশিষ্ট ভঙ্গিমায় পুলিশদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চালালেন। পুলিশদের সম্মুখে যে কোনো উপায়ে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা জরুরী। হয়তো তারা আস্তাবলের ভেতর ঢুকবে না। এরূপ আশা ও সাহসিকতা নিয়ে তিনি বাক্যালাপ শুরু করলেন। অফিসারদের সব কথার জবাব স্বাভাবিকভাবে প্রদানের পর মুসাহাফা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেন। অফিসার ঘোড়া থেকে নেমে বললো, রাও সাহেব! আপনার আস্তাবলের ঘোড়ার খুব নামডাক শুনেছি। এ কারণে

আপনাকে অগ্রে না জানিয়েই চলে আসলাম। একথা বলে সে আস্তাবলের দরোজার নিকটবর্তী হতে লাগলো।

বাইরে হাসিমুখ কিন্তু ভেতরে তুমুল তোলপাড়। এ ছিলো রাও সাহেবের অবস্থা। না পারছিলেন কিছু বলতে, না পারছিলেন কিছু করতে। তবে তার বাহ্যিক অবস্থা স্বাভাবিকই ছিলো। কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো না। অফিসার ভাবলো, খবরদাতা নিশ্চয়ই ভুল তথ্য দিয়েছে! নিজের প্রিয় মুর্শিদ যদি এখানে কোথাও লুকিয়ে থাকতেন তাহলে রাও সাহেবের অবস্থা এরূপ স্বাভাবিক কিভাবে থাকতে পারে? সে মনে মনে ঐ গুপ্তচরের প্রতি রাগান্বিত হচ্ছিলো। সফরের কষ্ট ও ব্যর্থতার গ্লানি তাকে আড়ষ্ট করে নিচ্ছিলো। কিন্তু এরপরও ঐ ভাঙ্গা আস্তাবলটির ভেতরে একবার না ঢুকে কিভাবে ফেরত যাওয়া যায়! সে ধীরে ধীরে দরোজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো। এ মুহূর্তে রাও সাহেবের অবস্থা কী ছিলো তা পাঠক নিশ্চয়ই অনুভব করে থাকবেন। কিন্তু ভেতরে হাজী সাহেবকে চোখে পড়লো না! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার মহিমার শেষ নেই। পুরো কক্ষের ভেতর কোথাও হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দেখা গেলো না। রাও সাহেব তো থ! তিনি বুঝতে পারলেন না হযরত কোথায় আত্মগোপন করলেন? কারণ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে পুলিশের দৃষ্টি এড়ানোর কোনো উপায়ই ছিলো না। আর বাস্তবে তা-ই হলো। হাজী ইমদাদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পুলিশ থাকাবস্থায় সেখানে থেকেও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রাও আবদুল্লাহ খান সাহেব জানতেন, এটা তার প্রিয় মুর্শিদের বিরাট কারামাত। তিনি মনে মনে আল্লাহর পবিত্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন। এদিকে পুলিশ অফিসার পুরো কক্ষ তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলো। সে ভীষণ রাগান্বিত হচ্ছিল ঐ গুপ্তচরের দিকে। এক পর্যায়ে খান সাহেবকে প্রশ্ন করলো, "এখানে পানির পাত্র এবং পানিতে ভেজা জায়গাটুকু দেখছি কেনো?" তিনি বললেন, "এখানে মুসলমানরা নামায আদায় করে থাকেন। পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে পানি দ্বারা হাতমুখ ধৌত করতে হয়।" আপনি আসার দশ মিনিট পূর্বে তারা এখানে নামায আদায় করেছেন। অফিসার বললো, "আমি তো জানতাম নামায পড়া হয় মসজিদে, তো এই আস্তাবলে ... ?" খান সাহেব সাথে সাথে জবাব দিলেন, "মসজিদ তো ফরয নামায আদায়ের জন্য। এখানে আদায় হয় গোপন নামায।

আল্লাহর একান্ত নৈকট্য হাসীলের আশায় এ নামায পড়েন পরহেজগার মুসলমানরা- এ ইবাদতের কথা কেউ টের পায় না!" অফিসার জবাব শুনে চুপ হয়ে গেল। এরপর দরজা খুলে ঘোড়ায় আরোহণ করে সঙ্গীদেরসহ দ্রুত প্রস্থান করলো। রাও সাহেব তাকে এগিয়ে দিয়ে আসলেন। একটু পরই রাও আবদুল্লাহ সাহেব আস্তাবলে এসে দেখেন হাজী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ মুসাল্লায় নামাযরতই আছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁকে তাঁর কুদরতের মাধ্যমে বাঁচাতে পারেন।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহিমাহুল্লাহ

দ্বিতীয় হাজ্জে যাত্রার সময় এক অত্যাশ্চর্য কারামত প্রকাশ পায়। হযরতের ভাতিজা ও সফরসঙ্গী মৌলভী আজিজুর রহমান বর্ণনা করেন, "আমরা যাত্রার শুরুতে ট্রেনযোগে বুম্বাই যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক স্টেশনে পৌঁছলে ফযরের নামাযের ওয়াক্ত হলো। সফরের আমীর ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবাইকে নির্দেশ দিলেন, নামুন। ফযরের নামায স্টেশনের প্লাটফর্মে পড়ে নেবো। সুতরাং সকলে নেমে গেলেন। হযরত প্রথমে দুই রাকাআত সুন্নাত আদায় করলেন। ট্রেনের সকল মুসলমান পুরুষ নামাযের জন্য নেমে পড়লেন। জামাআত শুরু হয়ে গেল। ঐদিকে ট্রেন ছাড়ার হুইসেল পড়লো। নামাযের তখনো অনেক বাকী। অনেক লোক হুইসেল শোনে নামায ভেঙ্গে ট্রেনে উঠে গেলেন। এদিকে ইমামে রাব্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি খুব ধীরস্থিরে নামায পড়াচ্ছিলেন। ট্রেন চলে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি যেনো কিছুই বুঝেন নি। ট্রেনের চালক চেষ্টা চালালো ট্রেন ছেড়ে দিতে। কিন্তু আল্লাহর কী কুদরাত! ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। চালক বার বার চেষ্টা করেও ট্রেন চালাতে পারলো না। পুরো পনের মিনিট চলে গেল। ইমামে রাব্বানী শান্তিমতো নামায পড়ে ট্রেনে আরোহণ করলেন। তাঁর সীটে বসার পরই ট্রেনখানার ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে ওঠলো। ট্রেন চলতে লাগলো। অবশেষে ট্রেনখানা ঠিক সময় মতোই বুম্বাই স্টেশনে পৌঁছলো।

অপর আরেক কারামত প্রকাশ পেলো বুম্বাই শহরে অবস্থানকালে। হযরতের বেশ কিছু সফরসঙ্গী তখনো কাফিলার সঙ্গে এসে যোগ দেন নি। যেদিন জাহাজ

আসার কথা ছিলো সেদিন আসলো না। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ ২২ দিন পর জাহাজ আসলো। ইতোমধ্যে হযরতের সকল সফরসঙ্গী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কাফিলার সঙ্গে যোগ দিলেন। বুম্বাই থেকে একটি জার্মান জাহাজযোগে কাফিলা ৮ দিনের সমুদ্রভ্রমণ শেষে আদেন শহরে পৌঁছলেন। একদিন ও একরাত এখানে অবস্থানের পর জাহাজ জিদ্দার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালো। আরো ৬ দিনের ভ্রমণশেষে জাহাজ জিদ্দায় এসে থামলো। ২১ জিলকদ কাফিলা মক্কা মুকাররমায় পৌঁছলেন।

শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহিমাহুল্লাহ

১. দু'আর বরকত: সিলেট শহরের কোথাও একবার অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন সিলেটে অবস্থান করছিলেন। একদল লোক ছুটে এলো তাঁর কাছে। আগুন থেকে রেহাই পেতে দু'আ চাইলো। তিনি দু'আ করলেন। সাথে সাথে হঠাৎ আগুন নিভে গেল। [চেরাগে মুহাম্মদ]

২. ট্রেন ফিরে আসা: সিলেট থেকে দেওবন্দ যাচ্ছিলেন শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। সিলেট স্টেশনে তখন মাগরিবের সময় আসন্ন। এদিকে প্লাটফর্ম ছেড়ে গাড়ি চলে যাওয়ার সময়ও উপস্থিত। সবাই তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে আরোহণ করলো। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশ্চিন্তে স্টেশনের এক জায়গায় জামাআতের সঙ্গে নামায শুরু করলেন। এদিকে ট্রেন ছেড়ে দিল। বেশ দূরে চলে গেল। অত্যন্ত ধীরস্থিরে নামায আদায় করে তিনি বসে আছেন। দেখা গেল ট্রেনখানা আবার প্লাটফর্মে ফিরে আসছে! আল্লাহ মা'লুম, ট্রেনের ইঞ্জিনে কী যেনো গণ্ডগোল ছিল। স্টেশনে ফিরে আসার পর মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর 'নামাযী' সঙ্গীরা ট্রেনে আরোহণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনের যান্ত্রিক সমস্যা দূর হলো এবং তা গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করলো। [প্রাগুক্ত]

৩. খাট থেকে জিকিরের আওয়াজ: জে.কে. স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৌলভী আবদুল বারী নবীগঞ্জী বলেন, 'একবার হযরত শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি করিমগঞ্জ আসলেন। সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমিও সেথায় গেলাম। ঐদিন বদরপুরের বার্ষিক জলসাও ছিলো। আমি বদরপুর মাদ্রাসায়ও গেলাম। মাদ্রাসার বারান্দায়

একখানা ছোট্ট খাট। আমি সেটির উপর বসলাম। কী আশ্চর্য! একটু পরই শুনতে পেলাম জিকিরের শব্দ। একই সঙ্গে খাটখানায় শুরু হয়েছে কম্পন। আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। খাট থেকে উঠে খোঁজ করে জানতে পারলাম, হযরত শায়খ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই খাটের উপর বসে অযু করেছেন। এখানে খাটটি রাখার উদ্দেশ্যও ছিলো তা-ই।’ উল্লেখ্য মৌলভী আবদুল বারী সাহেব এই ঘটনাটি হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিলুল কদর খলিফা হযরত লুৎফুর রহমান বর্ণভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট ই’তিক্বাফ পালনকালে বর্ণনা করেছিলেন। [প্রাগুক্ত]

৪. খাদ্যে বরকত: মুখিয়া, দেওবন্দের হাজী আহমদ হুসাইন সাহেব বর্ণনা করেন, ‘একবার দেওবন্দে জমিয়তের কনফারেন্স হয়। আমি হযরত শাইখুল ইসলামসহ মোট ৫০ জন মেহমানকে আপ্যায়নের আয়োজন করি। ... কিন্তু হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন খাবার খেতে আসলেন তখন দেখা গেলো তাঁর সঙ্গে অন্তত চার-পাঁচ শত লোক! আমি একেবারে হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। সময় খুব অল্প, কিছুতেই আরো খাবার পাকানো সম্ভব নয়। কী করি? একজন পরামর্শ দিলেন, ব্যাপারটি আপনি নিজে যেয়ে হযরতকে অবগত করুন। আমি তা-ই করলাম। তিনি আমার সঙ্গে খাবার কক্ষে ঢুকলেন। রুটির ঝুড়ি পোলাওয়ের ডেগের নিকট রেখে দীর্ঘক্ষণ কিছু পাঠ করার পর ফুঁ দিলেন। এরপর বললেন, মেহমানদের খাবার পরিবেশ করো। খাবার বের করার সময় ডেগের ঢাকনা ওঠাবে না। আমার জন্য একটি চারপায়ী এনে দাও। আমি তা-ই করলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আমরা মেহমানদের খাওয়ানো শুরু করলাম। তিন মাহফিল খাওয়ানো হলো। চতুর্থ মাহফিলে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজেও শরীক হলেন। আল্লাহর কী অপূর্ব দয়া! মাত্র ৫০ জনের খাবার দ্বারা প্রায় চারশত মেহমান তৃপ্তিসহ খেলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর ভাবলাম, খাদিম যারা রয়ে গেছি তাদের জন্য তো নিশ্চয়ই কোনো খাবার আর বাকী নেই। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ঢাকনা উঠিয়ে দেখি আমাদের সবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পোলাও ডেগের মধ্যে রয়ে গেছে। [প্রাগুক্ত]

৫. এক বিস্ময়কর কারামত: মদীনা মুনুওয়ারায় কিবলা দক্ষিণ দিকে। প্রখ্যাত সবুজ গম্বুজটি পূর্ব কোণে অবস্থিত। পশ্চিমদিকে ‘বাবুর রাহমাত’ সংলগ্ন দেওয়ালের নিকট বসে হযরত শাইখুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারস

দিচ্ছেন। সবুজ গম্বুজের জাফরী সামনেই দেখাচ্ছে। দারসে উপস্থিত ছাত্রদের একজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কবর শরীফে জিন্দা আছেন’, আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের এই আক্বীদার উপর সন্দেহ করতেন। বার বার তিনি প্রশ্ন করছিলেন। তিনি এটা মানতে সম্পূর্ণ নারাজ। এক পর্যায়ে মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সবাইকে বললেন, তোমারা চোখ বন্ধ করো। ক্ষণকাল পর বললেন, এবার রওজা মুবারকের দিকে তাকাও। সবাই অবাক! তাদের চোখের সামনে না ছিলো জাফরী কিংবা কোন পর্দা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পবিত্র চেহারায় স্নিগ্ধ হাসির রেখা। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিছু বলতে চাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত মুবারক দ্বারা ইশারা করে মানা করলেন। ক্ষণকাল পর সবকিছু পুনরায় স্বাভাবিক হলো। [ঘটনাটি হযরত আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিসহ অনেকে বর্ণনা করেছেন]

৬. দু’আর বরকতে ফাঁসির আদেশ রহিত: এ ঘটনার মূল বর্ণনাকারী ফিদায়ে মিল্লাত হযরত আসআদ মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। একদা সবেরমতি জেলে বন্দী থাকাবস্থায় একব্যক্তি হযরতের নিকট ছুটে এসে তাঁর এক সঙ্গীর ফাঁসির হুকুম থেকে বাঁচার জন্য দু’আ চাইলো। তিনি প্রথমে রাগ করলেন। মুনশী মুহাম্মদ নামক এ ব্যক্তির নিকট ফাঁসির হুকুমের আসামী বারবার আবদার করতে লাগলো, তুমি তোমার বাপুকে গিয়ে বলো, আমার জন্য দু’আ করতে। সুতরাং খুব পীড়াপীড়ি করায় হযরত এক পর্যায়ে বললেন, আচ্ছা। তাকে অমুক ওজিফা পাঠ করতে বলুন। দু’তিন দিন কেটে গেল। ফাঁসির আদেশ কার্যকর হওয়ার খুব বেশিদিন বাকী নেই। লোকটি আবার আবদার করলো, যাও! তোমার বাপুকে বলো, আমার জন্য দু’আ করতে। মুনশি সাহেব আবার আসলেন। আবদার করলেন। হযরত এবার বললেন, তাকে গিয়ে বলো সে মুক্ত হয়েছে! কিন্তু আসলে তার মুক্তির কোনো হুকুম আসে নি। দু’এক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর লোকটি ছটফট করতে লাগলো। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলার সময় আসন্ন। কিন্তু আল্লাহর কী কুদরত! ফাঁসি কার্যকর হওয়ার একদিন মাত্র বাকী থাকতে তার আদেশ রহিত হল। লোকটি হযরতের দু’আর বরকতে বেঁচে গেল। [প্রাগুক্ত]

৭. দুরাত্মা যোগির তাসাররুফ থেকে মুক্তি: একব্যক্তি দেওবন্দে এসে হযরতের নিকট আবদার করলো, হুজুর! চৌদ্দ বছর পূর্বে এক কূপ থেকে পানি উত্তোলনকালে এক যোগি আমার নিকট এসে কি যেনো করলো, সেই থেকে আমি তার পেছনে লেগে আছি। তার আকর্ষণ থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছি না। কিন্তু আমি মুসলমান। হযরত একথা শুনে লোকটিকে থাপ্পড় মারলেন! একটি ওজিফা পাঠের নির্দেশ দিলেন। রাতে ওজিফা পাঠ করে সে ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে দেখে, একটি সিংহ তার উপর হামলা করছে। হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একখানা তরবারি হাতে ঐ সিংহের উপর হামলা করে বধ করে দিলেন। সকালে সে এই স্বপ্নের কথা হযরতের কাছে বললো। তিনি বললেন, যাও! এখন তোমার বাড়িতে চলে যাও। [প্রাগুক্ত]

হযরত আলী আসগর নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

হযরত নূরী চৌধুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির এক আত্মীয়া ও মুরীদা অত্যাশ্চর্য এক কারামতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একদা কোনো এক ব্যক্তি অতি অল্প কিছু হালুয়া [তুশা] শিরনী হযরতের সম্মুখে নিয়ে আসলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনেক লোক। এই অল্প হালুয়া সবাইকে পরিবেশন সম্ভব নয় ভেবে লোকটি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হযরত নূরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “সব তুশা শিরনীকে বরই বিচির মতো করে ছোট ছোট বলে পরিণত করো।” লোকটি তাই করলেন। এরপর বললেন, “সবার হাতে একেকটি বল দাও।” সবার হতে এই অত্যল্প হালুয়া দেওয়ার পর তিনি বললেন, “আপনারা সকলে এক হাতের তালুতে এই বলটি নিয়ে অপর হাত দ্বারা ঢেকে দিন।” সবাই তা-ই করলেন। ক্ষণকাল পর বললেন, “এবার হালুয়া ভক্ষণ করুন!” সুবহানাল্লাহ! সবাই দেখলেন প্রতিটি বল বেশ বড় হয়ে হাত ভরে গেছে!

একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী মাওলানা শফিকুর রহমান সাহেব থেকে বর্ণনা

করেন, "একদা কোনো এক বাড়িতে তাঁকে রাতের খাওয়ার জন্য দাওয়াত করা হয়। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে ভুলে যান ও নিজের বাড়িতেই খাওয়া শেষে ঘুমের কক্ষে চলে গেলেন। এরপর হঠাৎ স্মরণ হওয়ায় কাউকে না বলেই সে বাড়িতে চলে যান। সেখানে যাওয়ার পর কিছুটা খেয়ে রাতে থেকে যান। তিনি পরদিন যখন বাড়িতে ফিরে আসলেন, পরিবারের সকলে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কোথায় থেকে আসলেন?' তিনি বললেন 'অমুকের বাড়িতে আমি রাত কাটিয়েছি'। তারা সকলে আরো অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু আমরা তো পরিষ্কার শুনেছি, আপনি গতরাতে তাহাজ্জুদের সময় সজোরে জিকির করছেন!"

কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ

(১) অন্তর্দৃষ্টি

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খলীফা শাল্লার (সুনামগঞ্জের) ক্বারী শায়খ বিলাল আহমদ বর্ণনা করেন: "আনন্দপুর নামক গ্রাম থেকে একদা হযরতের সঙ্গে রওয়ানা দিলাম। তখন রাত ১১টা। আমরা যখন কাফাইল্সেও নামক বাজারের নিকটে আসলাম তখন হঠাৎ হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দাঁড়িয়ে গেলেন। নীরবে কি যেন ভাবতে লাগলেন। আমি জানতে চাইলাম, 'হযরত! আপনি দাঁড়ালেন কেন?' তিনি জবাব দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম। এবারও তিনি নীরব। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর বললেন, "শোন! অচিরেই বিধর্মীরা মুসলমানদের জান-মালের বিরাট ক্ষতি করবে।" বর্ণনাকারী বলেন, সত্যিই এর কিছুদিন পর আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর আমেরিকা কর্তৃক হামলা শুরু হয়।"

(২) ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাওয়া

হযরতের বড় সাহেবজাদা মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব ৮ এপ্রিল ২০০৬ ঈসায়ী রাত ১০ ঘটিকার সময় আমাকে (লেখককে) মোবাইল করে জানালেন: "গত ৭ এপ্রিল ২০০৬ ঈসায়ী রাত ৯ ঘটিকার সময় সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে হযরতের এক অত্যাশ্চর্য কারামত প্রকাশ পেয়েছে। খাদীমুল কুরআন কর্তৃক

আয়োজিত তিনদিনব্যাপী তাফসীর মাহফিলের শেষ দিন (শুক্রবারে) মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী তাফসীর পেশ করছিলেন। হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠলো। শুরু হলো প্রচণ্ড বেগে ঝড়-তুফান ও বৃষ্টি। তিরপালের তৈরী বিরাট প্যান্ডেলটি লণ্ড-ভণ্ড হতে লাগলো। হাজার হাজার শ্রোতা প্যান্ডেল ছেড়ে ছুটতে লাগলেন চতুর্দিকে।

এরপর হঠাৎ ওলিপুরী সাহেবের হাত থেকে মাইক্রফোন নিয়ে হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “বসো! সবাই বসো! আমার সাথে দু’আ পড়ো: আল্লাহুম্মা হাওয়া-ল্লাইনা লা আ’লাইনা” [اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا لَا عَلَيْنَا]-মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ] মানুষ তাঁর সঙ্গে দু’আ পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ দু’আ পাঠের পর এক প্রচণ্ড ডাক দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলো। সুবহানাল্লাহ! এরপর রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী তাফসীর করলেন। তিনি এক পর্যায়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর ওলির কারামত আপনারা আজ সকলে প্রত্যক্ষ করলেন।”

(৩) জিনদের মুর্শিদ

একবার আমি (লেখক) ১০ দিন স্থায়ী এক সফরে যাই হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খাদিম হিসাবে। সেদিন ছিলো ২৪ এপ্রিল ২০০৫ ঈসায়ী। আমি হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দফতরে বসে তাঁর সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলাম। বড় থালায় আমাদের সঙ্গে আরো ৬ জন খাচ্ছিলেন। এক তাগড়া নওজোয়ান ছেলে কিছু আবুল-তাবুল বকছিলো। একদল লোক এ ছেলেকে নিয়ে এসেছেন জগন্নাথপুর থানার ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর গ্রাম থেকে। খাবার খেতে খেতে তারা জানালেন, ছেলেটি কবরস্থানে যেয়ে জিন সম্প্রদায়ের এক ‘মহিলাকে’ দেখেছে। এরপর থেকে সে আবুল-তাবুল বকছে। বার বার বলছিলো, ‘আমাকে ঐ জিন মহিলা বলেছে, তুমি হযরত শায়খে কাতিয়ার নিকট চলে যাও। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের অনেকেই তাঁর মুরীদ।’

হযরত শায়খে কাতিয়া নীরবে তার কথাগুলো শ্রবণ করলেন। এরপর তাকে নির্দেশ দিলেন, “আজ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত তুমি মসজিদে অবস্থান করবে। কোন

কথা বলতে পারবে না। নামায আদায় করবে, পাস-আনফাস ও তেরো তাসবীহ জিকির করবে।” ছেলেটি তাঁর কথা শ্রবণ করামাত্র নীরব হয়ে গেল। মনে হলো সে অনেকটা সুস্থ হয়ে গেছে।

(৪) দেরিতে লঞ্চ আসা

হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হযরত শায়খ মৌলভী গোলাম ওয়াদুদ আজমিরিগঞ্জী বর্ণনা করেন, “আজ থেকে ১৫-১৬ বছর আগের কথা (১৯৯৫-৯৬ ঈসায়ী)। একদা আমি মনজুর নামক এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে কাতিয়া গ্রামে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিলো হযরতের সাথে সাক্ষাৎ ও দু’আ নিয়ে ফিরে আসা। যা হোক, সময়মতো পৌঁছে হযরতের সুহবতে বেশ কিছুক্ষণ কাটালাম। এরপর বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে তিনি বললেন, “যাইবায়, যাইবায়, বসো!” আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো আজমিরীগঞ্জগামী দিনের শেষ লঞ্চ ধরা। পৌনে দু'টো কিংবা দু'টোর সময় লাস্ট ট্রিপ। ঐ সময় কাতিয়া মাদ্রাসায় যুহরের নামাযও হতো পৌনে দু'টোয়। লঞ্চঘাট পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। সুতরাং সোয়া একটার সময় কাতিয়া থেকে বিদায় হতে হবে। কিন্তু হযরত আমাদেরকে বিদায় হতে দিচ্ছিলেন না।

যা হোক, হযরতের নির্দেশ মুতাবিক বসে রইলাম। যুহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। ভাবলাম, আজ আর যাওয়া হবে না। থেকে যেতে হবে। পৌনে দু'টোয় যুহরের নামায আদায় করলাম মাদ্রাসা মসজিদে। সালাম ফেরানোর পরই হঠাৎ হযরত আমাকে ডেকে বললেন, “ওবা গোলাম ওয়াদুদ! তোমরা চলে যাও! লঞ্চে গিয়ে সুন্নাত আদায় করবে!” আমি কিছুটা অবাক হলাম। ভাবলাম, এখন তো লঞ্চ চলে যাওয়ার কথা। অথচ হযরত বলছেন, “লঞ্চে গিয়ে সুন্নাত পড়ো”। শুধু তাই নয়, তিনি আরো বললেন, “যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে যেয়ো!”। একজনকে নির্দেশ দিলেন, আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসতে।

হযরতের এই কথাগুলো আমার বুঝে আসছিলো না। ভাবলাম, হয়তো তাঁর স্মরণে নেই যে, শেষ লঞ্চ এখান থেকে পৌনে দু'টো কিংবা দু'টোয় ছাড়ে। যা হোক, তাঁর নির্দেশ মতো আমরা সুন্নাত আদায় না করেই মেহমানখানায় চলে গেলাম। আমাদেরকে খাবার পরিবেশন করা হলো। খাওয়া শেষে দেখলাম পৌনে

তিনটে বেজে গেছে। হযরতের নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে কিছু বিরক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম ওখানে যেয়ে ফিরে আসবো। কারণ, লঞ্চ তো পাওয়ার কথা নয়। ঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল তিনটে থেকেও বেশী হবে। একটু পর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম ফেচির বাজারের উত্তর পূর্বে ওপারের গ্রাম দিঘলবাক ঘুরে কুশিয়ারা নদীর উপর দিয়ে লঞ্চ আসছে! আরোহণের পর পরিচিত লঞ্চ-চালক প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কোত্থেকে এই অসময়ে লঞ্চঘাটে আসলেন?'। আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'আপনি লঞ্চ নিয়ে এতো দেরীতে আসলেন কেন?'। তিনি বললেন, 'আর বলুন না! শেরপুর গণ্ডগোল লেগে যায়। এতে আমাদের লঞ্চ ছাড়তে ঘণ্টা দেড়ঘণ্টা দেরী হয়েছে!' হযরতের নির্দেশ মুতাবিক আমরা লঞ্চে উঠে যুহরের সুন্নাত অবশ্যই পড়ে নিয়েছিলাম।

(৫) খাবার আনো!

হযরত মাওলানা আবদুল মতিন নবীগঞ্জী সাহেব হযরতের একটি কারামত প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন, ইন্তিকালের পূর্বে হযরতের শরীরে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তিনি তখন অসুস্থ অবস্থায় তাঁর বড় সাহেবজাদির বাসায়। আমরা খবর পেয়ে কাজিটুলা মসজিদে ইশার নামায আদায় করে তাঁকে দেখতে যাই। এই দলে আমরা মোট আটজন ছিলাম।

হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন বিছানার উপর ঘুমোচ্ছিলেন। আমাদের আগমনের কথা জানতে পেরে উঠে বসে গেলেন। সালাম-কালাম শেষে আমরা তাঁর হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। এরপর তিনি বললেন, খাবার আনো, খাবার আনো! দস্তারখান বিছিয়ে দাও! এসময় রাত সাড়ে ন'টা হবে।

হযরতের সাহেবজাদী আশ্চর্য হয়ে আমাদেরকে অবগত করলেন, আব্বা সাহেব তো খাচ্ছেন না। তিনি খেতে পারছেন না। এখন হঠাৎ খাবার চাচ্ছেন যে! খাবার তখনো পকানো হয় নি। এছাড়া আমরা আটজন লোকের খাবার সাথে সাথেই প্রস্তুত হয়ে যাবার কথাও নয়। এই মুহূর্তে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। হযরতের নাতি মুফতি মনজুর রশীদ আমিনী এসে বললেন, নানা সাহেব! উপশহর থেকে আপনার এক ভক্ত বেশ কিছু খাবার নিয়ে এসেছেন। আপনি খেয়ে নিন। হযরত বললেন, আনো, আনো তাড়াতাড়ি আনো। এরপর আমরা সকলে হযরতের সঙ্গে খাবার

খেতে বসে পড়লাম। সবাই পেট পুরে খেলাম, হযরত নিজেও আমাদের সাথে খেলেন। ঠিক এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর ওলির ইচ্ছাকে পূর্ণ করলেন। ঘরে খাবার প্রস্তুত হয় নি, তথাপি অন্য লোক দ্বারা খাবার পাঠিয়ে তাঁকে ও তাঁর মেহমানদেরকে খাওয়ালেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

(৬) খাবার আসার সংবাদ

একদা আমি (গ্রন্থকার) কাতিয়া মাদ্রাসায় হযরতের খাস কামরায় উপস্থিত ছিলাম। আরো আট দশজন লোক ছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “থালা আনো, খাবার আনো, সবাইকে নিয়ে খাবার খাবো।” একজন খাদিম বড়ো একটি থালা এনে দিলেন। হাত ধৌত করে আমরা অপেক্ষা করছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরও যখন খাবার আসলো না, হযরত বললেন, “ওহে! কি হলো? খাবার কোথায়- ভাত-তরকারি কোথায়?” খাদিম ইশারা-ইঙ্গিতে জানালো, বাড়িতে কিংবা বোর্ডিংয়ে খাবার নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। হযরত বুঝতে পেরে বললেন, “আচ্ছা, দেখি আল্লাহ তা’আলা কিছু পিঠা-শাকও দেন কি না!” তাঁর এ কথায় আমরা আশ্চর্য হলাম। পিঠা-শাক আসবে কোত্থেকে?

কী আশ্চর্য! মাত্র মিনিট খানেক পর এক ব্যক্তি এসে কক্ষে ঢুকলো। তার হাতে বেশ বড়ো একটি টিফিন ক্যারিয়ার। হযরত বললেন, কে? এটা কি? তিনি বললেন, হযরত! আমি অমুক দূরবর্তী গ্রাম থেকে এসেছি। আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ কিছু চিতল-পিঠা ও শাক নিয়ে এসেছি! আমরা সকলে একথা শোনে একেবারে থ! সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর ওলিদের মনের আকাঙ্ক্ষা তিনি কেমনে যে পূর্ণ করবেন, তা কেউ জানে না। অবশেষে সবাই মিলে পেটপুরে ঐ মজাদার চিতল-পিঠা ও শাক দ্বারা খেলাম।

(৭) গানের মঞ্চে জিকির

হযরত কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জলিলুল কদর খলীফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী দামাত বারাকাতুহুম বর্ণনা করেন, হযরতের এক বিশিষ্ট মুরীদ আমাকে একবার একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেন। “হবিগঞ্জ এলাকায় কোন এক গ্রামে তিনি মেহমান ছিলেন। রাত গভীর হওয়ার পর শোনা

গেল গান-বাজনার আওয়াজ। বেশ দূরে এক বিরাট গানের আসর চলছিলো। মেজবান মনে মনে ভেবেছিলেন, এতো দূর থেকে আওয়াজ এখানে আসবে না। কিন্তু মাইকের আওয়াজ এসে গেছে তা শ্রবণ করে তিনি কিছুটা লজ্জাবোধ করছিলেন। হযরত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের আওয়াজ? তিনি আমতা আমতা করে বললেন, হযরত! মাফ করুন, আমি মনে করি নি এত দূর থেকে আওয়াজ এখানে আসবে। যা হোক, সবাই ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। রাত আরো গভীর হলো। হযরত কাউকে না বলে, গল্লা হাতে বেরিয়ে পড়লেন। মাহফিলের অনেকেই পরে বলেছেন, তিনি ঐ বিরাট প্যান্ডেলের দিকে ছুটে গেলেন। সরাসরি স্টেজে উঠে মাইক্রফোন হাতে নিয়ে জিকির শুরু করলেন। ইতোমধ্যে লোকজন চতুর্দিকে ছুটে পালালো। তিনি সবাইকে বলতে লাগলেন, ও মিয়ারা! আও, জিকির পড়ো! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

উল্লেখ্য সেখানে হাজার হাজার শ্রোতা ছিলেন, পাহারাদার হিসাবে পুলিশ-বিডিআর ছিলো। গায়ক-বাদক সবাই হযরতকে দেখেই চতুর্দিকে ছুটে পালায়। ছুটে পালানোর সময় অনেকে আছাড় খেয়ে পায়ে ব্যথা পয়েছেন, কেউ কেউ হাঁটুতে আঘাত পেয়েছেন। কারো কারো রক্ত ঝরেছে। হযরতের আহ্বানে এদের কেউ কেউ প্যান্ডেলের ভেতর ফিরে আসলেন। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, ব্যাপার কি? আপনারা শুধুমাত্র শেখ সাহেবকে দেখেই এতো ভয় পেলেন বুঝি! ছুটে পালানোর সময় আছাড়-বিছাড় খেলেন? সে বললো, আমরা দেখলাম হযরতের পেছনে হাজার হাজার মানুষ লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে আসছেন! আমরা জীবন রক্ষার্থে পালিয়ে যাই। অথচ, আসলে তিনি একাই সেখানে গিয়েছিলেন।"

(৮) বাসের ইঞ্জিন বন্ধ

বেশ আগের কথা। একদা হযরত শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একখানা বাসে চড়ে মৌলভীবাজার যাচ্ছিলেন। বাসের ড্রাইভার ট্যাপে গান বাজাতে শুরু করলো। হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নির্দেশের সুরে বললেন, "ওহ মিয়া! ট্যাপ বন্ধ করো!" ড্রাইভার হযরতকে চিনতো না। সে তাঁর নির্দেশে পাত্তা দিলো না। একাধিকবার নির্দেশ দেওয়ার পরও যখন ট্যাপের গান বন্ধ হলো না, কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, "আরে মিয়া! গান যখন বন্ধ করবে না,

তাহলে আমাকে বাস থেকে নামিয়ে দাও!” ড্রাইভার রাজী হয়ে গেল। বাসের অন্যান্য আরোহীরাও প্রথমে তাঁকে চিনতে পারেন নি। তাঁকে রাস্তায় নামিয়ে দিল ড্রাইভার। বর্ণনাকারী বলেন, আমার দিল কাঁপছিলো, ঐ ড্রাইভার ব্যাটার অবস্থা কি হয়- আল্লাহ মা’লুম!

কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ বাসের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বার বার চেষ্টা করার পরও ইঞ্জিন স্টার্ট হলো না। বাসের প্যাসেঞ্জাররা নেমে পড়লেন। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিকে তাকিয়ে এক দু’জন তাঁকে চিনতে সক্ষম হলেন। তারা ড্রাইভারের নিকট যেয়ে বললেন, সর্বনাশ! তুমি কার সাথে বে-আদবী করেছো- জানো? উনি তো কাতিয়ার শেখ সাহেব! যাও এক্ষুণি যেয়ে তাঁর পায়ে পড়ো। মাফ চাও!

ড্রাইভার ছুটে এলো হযরতের নিকট। সত্যিই সে পায়ে পড়লো। মাফ চাইলো। তিনি বললেন, আর ট্যাপ বাজাবে না? সে জবাব দিল, না জুহুর না, আর বাজাবো না। তিনি বললেন, মাথায় টুপি দেবে? সে বললো, এক্ষুণি দিচ্ছি। এরপর হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, “তাহলে চলো!” গাড়িতে আরোহণ করে ড্রাইভারকে বললেন, “বিসমিল্লাহ, বলে ইঞ্জিন স্টার্ট দাও!” আশ্চর্যের ব্যাপার, সাথে সাথে ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেল। এরপর মৌলভীবাজার পৌঁছা পর্যন্ত গাড়ির ইঞ্জিন আর একবারও বন্ধ হয় নি। (সূত্র: কাতিয়ার এক ব্যক্তি আমার (লেখকের) নিকট বর্ণনা করেছেন যার নামটি এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না।)

হযরত সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত তুসতারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “নির্জন এক স্থানে অত্যন্ত গরীব একজন বৃদ্ধা মহিলার সাক্ষাৎ পাই। আমি তাকে একটি মুদ্রা দান করতে চাইলাম। মহিলা এটি গ্রহণ না করে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন। আমি দেখলান তার হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা এসে গেছে গায়েব থেকে। তিনি মৃদু হেসে বললেন, ‘তুমি আমাকে নিজের পকেট থেকে মুদ্রা বের

করে দিতে চাচ্ছো। আমি মুদ্রাপ্রাপ্ত হই গয়েব থেকে।’ একথা বলার পর মহিলাও গায়েব হয়ে গেলেন।[৫১]

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লার শাগরিদ

প্রখ্যাত ওলি হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর একজন শাগরিদ ছিলেন যিনি খানক্বায় থাকাবস্থায় ধৃষ্টতামূলক এক আচরণ করে বসলেন। ব্যাপারটি জানাজানি হওয়ার পর শাস্তি থেকে বাঁচতে তিনি খানক্বাহ হতে পলায়ন করেন। এদিকে জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহ গোপনে তার অনুসরণ করলেন। শাগরিদ এক মসজিদে যেয়ে আশ্রয় নেন। জুনাইদ রাহিমাহুল্লাহকে দেখতে পেয়ে তার ভয় শতগুণ বেড়ে যায়। হঠাৎ মেঝের ওপর পড়ে গেলেন। তার মাথায় আঘাত পেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। জুনাইদে রাহিমাহুল্লাহ দেখলেন, শাগরিদের মাথার রক্ত মেঝে পড়ে আল্লাহ নাম ধারণ করছে!

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর আরেক মুরিদ বসরায় বসবাস করতেন। একদিন এক খারাপ চিন্তা তার মাথায় খেলতে লাগলো। সাথে সাথে তার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে কালো হয়ে গেলো। তিনদিন এ অবস্থায় থাকার পর তার মুখমণ্ডল পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসে। একই সময় হযরত জুনাইদের প্রেরিত একখানা চিঠি পেলেন। এতে লিখা ছিলো, “এ রাস্তার ভ্রমণ হতে হবে স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত। তোমার মুখমণ্ডল পরিষ্কার করতে আমার তিনদিন সময় লেগেছে!”[৫২]

হযরত হাসান নূরী রাহিমাহুল্লাহ

রাস্তার পাশে এক অন্ধ ব্যক্তি ‘আল্লাহ’, ‘আল্লাহ’ বলছিলো। হযরত হাসান নূরী কোথাও যাচ্ছিলেন। অন্ধের মুখে আল্লাহ নাম উচ্চারিত হতে দেখে জিজ্ঞেস

---

[৫১] তাযকিরাতুল আউলিয়া।

[৫২] প্রাগুক্ত।

করলেন, 'তুমি আল্লাহ সম্পর্কে কি জানো? যদি তাঁকে চিনে থাকো তাহলে কীভাবে তাঁকে ছাড়া বেঁচে আছো?

প্রশ্ন করতেই নূরী রাহিমাহুল্লাহ অজ্ঞান হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি খালি-পায়ে ছুটে গেলেন জঙ্গলে। একটি বাঁশের টুকরোর আঘাতে তার শরীর কিছুটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। তিনি দেখলেন রক্ত মাটিতে পড়ে বিশুদ্ধভাবে 'আল্লাহ' নাম অঙ্কন করেছে! একরূপ পাগল অবস্থায় তাঁকে বাড়িতে আনা হলো। তাঁর কণ্ঠে বার বার উচ্চারিত হচ্ছিল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর এ অবস্থায়ই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত উসমান হিরী রাহিমাহুল্লাহ

একদিন হযরত উসমান হিরী রাহিমাহুল্লাহ এক যুবকের সাক্ষাৎ পেলেন। সে ছিলো মাতাল ও তার হাতে শুভা পাচ্ছে বাদ্যযন্ত্র। তিনি তার হাত ধরে টেনে টেনে নিজের বাড়িতে গেলেন। গোসল করিয়ে ভালো দরবেশি কাপড় পরিয়ে দিলেন। এরপর হাত তুলে দুআ করলেন আল্লাহর দরবারে, "হে প্রভু! আমার ক্ষমতার ভেতর যা ছিলো তা আমি করেছি, এখন আপনি যা চান তা-ই করেন।" মুহূর্তের মধ্যে যুবকের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন এলো। বেঁহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। এরপর থেকে যুবক এক উচ্চপর্যায়ের ওলি হয়ে গেলেন।

হযরত উসমান মাগরিবীর সঙ্গে যুবকের সাক্ষাৎ ঘটলে বললেন, "আমি এ যুবককে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছি। দীর্ঘ ২০ বছরের সাধনা দ্বারা যা লাভ করতে পারি নি- এই যুবক তা লাভ করে নিলো আল্লাহর অনুগ্রহে মাত্র ক্ষণকালের মধ্যে।[৫৩]

[৫৩] মাওলানা আহমদ আলী 'The Miracle of the Saints' -তাযকিরাতুল আউলিয়া থেকে উদ্ধৃত।

হযরত আবদুল্লাহ খাফিফ রাহিমাহুল্লাহ

হযরত খাফিফ রাহিমাহুল্লাহ মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করলেন। এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে যেয়েও রসদপত্র বলতে একটি পানির পাত্র ও দড়ি ছাড়া কিছুই সাথে নিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো পিপাসার্ত হলে কোনো কূপ থেকে পানি তুলে পান করবেন।

একবার পিপাসার্ত হলেন। অদূরে একটি দেয়ালবেষ্টিত কূপ দেখলেন। কয়েকটি হরিণ কূপের পানি পান করছিলো। তিনি সেখানে গেলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য কূপের পানি নিচে নেমে গেলো। অনেক চেষ্টা করেও এক ফোটা পানি উত্তোলন করতে পারলেন না। তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বললেন, "হে আমার প্রভু! এ অধম কি বনের পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট?" গায়েবি জবাব শুনলেন, "তুমি তো পানপাত্র ও দড়ির ওপর ভরসা করছো। বনের পশুরা একমাত্র আমার উপর ভরসা রাখে। ফলে তাদের সব ব্যবস্থা নিজেই করে দিই।" এ আওয়াজ শুনে সাথে সাথে হাতের পাত্র ও দড়ি দূরে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহর দয়ায় কূপের পানি উপরে উঠে আসলো। তিনি পান করলেন তৃপ্তিসহ।

মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছুয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহর কাছে। তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমার তাওয়াক্কুল কতটুকু সে পরীক্ষা করেছেন। তুমি যদি পানি পান না করে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে তাহলে কূপের পানি দ্বারা সমগ্র এলাকা ভরে যেতো।"[৫৪]

হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহ

১. ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহকে জেলে বন্দি করে রাখ হয়। জেলখানায় সর্বমোট ৩০০ কয়েদি ছিলো। মনসুর রাহিমাহুল্লাহ চিৎকার দিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমরা সবাই কী মুক্ত হতে চাও?" তারা

[৫৪] মাওলানা আহমদ আলী, দ্যা মিরাকল অব দ্যা সেইন্টস, পৃ. ২৯।

সমস্বরে জবাব দিলো, “হ্যাঁ! আমরা মুক্ত হতে চাই।” মনসুর রাহিমাহুল্লাহ দুআ করলেন।

জেলের প্রতিটি কোঠার দরোজা খুলে গেলো। কিছু লোক বের হয়ে গেলো। কিন্তু গার্ডরা এসে পুনরায় কয়েদিদের বন্দি করলো।

২. মনসুর রাহিমাহুল্লাহ যেদিন বন্দি হয়ে জেলে আসলেন, সেদিনই খবর পেয়ে অনেক লোক তাঁকে দেখতে আসে। কিন্তু তিনি কোথায় কোন কক্ষে বন্দি ছিলেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় রাতে তাঁকে নির্দিষ্ট স্থানে পাওয়া গেলেও পুরো জেলখানা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তৃতীয় রাতে তাঁকে নিজস্ব কোঠায় পাওয়া গেলো। অর্থাৎ জেলও ছিলো তিনিও ছিলেন। আগন্তুকরা আগের দু রাতের ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করলো। তিনি বুঝিয়ে বললেন, ‘প্রথম রাতে আমি আমার প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত ছিলাম। দ্বিতীয় রাতে আমার প্রভু আমাকে দেখতে হাজির ছিলেন। এখন আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এ কারণে যে, আমি যেনো ওহির সত্যতা প্রমাণ করি। অর্থাৎ হুশ-বুদ্ধিসম্পন্ন কেউ যেনো বলে না- “আনাল হাক্ক” (আমিই সত্য)। কারণ কোনো মানুষ কখনও খোদায়ী গুণে গুণান্বিত হতে পারে না।

৩. হযরত মনসুর রাহিমাহুল্লাহকে কতল করার সময় প্রথমে তার দুটি বাহু কেটে দেওয়া হলো। এরপর দল্লাজ তাঁর পা দুটো কেটে ফেললো। এ অবস্থায় কাটা রক্তাক্ত হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মুছতে মুছতে বললেন, ‘আজ আমি আনন্দ বোধ করছি, শহীদের রক্ত আমার মুখমণ্ডলে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ এরপর তিনি নামাযের অবস্থায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দল্লাজ তার দুটি চক্ষু উপড়ে ফেললো। এরপর তাঁর জিহ্বা কাটলো, তারপর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো। জিহ্বা ও মস্তক কেটে ফেলার পূর্বমুহূর্তে হযরত মনসুর প্রার্থনা করলেন এই বলে: “হে প্রভু! আমি আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এ কারণে যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি আমাকে অটল রেখেছেন। আমি শুধু এটাই কামনা করছি যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যেও এরূপ দৃঢ়তা সৃষ্টি হোক।’ একথা শুনে উপস্থিত লোকজন তাঁর উপর অনবরত পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে।

৪. করুণ ও ভীষণ কষ্টকর অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত হযরত মনসুর রাহিমাহুল্লাহ হাসতে থাকেন। তবে একবার তিনি কাঁদলেন যখন প্রিয় পীরভাই ও বন্ধু আবু বকর শিবলী রাহিমাহুল্লাহ কয়েকটি ফুল তার ওপর নিক্ষেপ করলেন। আবু বকর প্রশ্ন করলেন, "হে মনসুর! কঠিন পাথরের আঘাতের সময়ও তুমি হাসলে অথচ আমি তোমার উপর ফুল নিক্ষেপ করলাম আর তাতে তুমি কাঁদলে- কেনো?" তিনি জবাব দিলেন, "হে আবু বকর! তুমি আমার প্রিয়জন এবং অবগত আছো যে, আমি নির্দোষ। তারপরও তুমি আমাকে ফুল দিয়ে আঘাত করলে। এ আঘাত আমার নিকট হাজারটি পাথরের আঘাত থেকে বেশি বেদনাদায়ক।" এরপর তাঁর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মুহূর্তে তিনি অট্টহাসি হাসলেন।

৫. কথিত আছে, হযরত মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পরও কাটা মাথা, দেহ, হাত, পা, জিহ্বা প্রভৃতি 'আনাল হাক্ক, আনাল হাক্ক' জিকির করতে লাগলো। খলিফা নির্দেশ দিলেন, তাঁর দেহাংশগুলো জ্বালিয়ে ছাই করে দজলা নদীতে নিক্ষেপ করতে। দজলা নদীতে ফেলে দেওয়ার পর পানি ফুলে উঠলো। বুঝা গেলো এক্ষুণি বিরাট বন্যা হবে। মনসুর হাল্লাজ রাহিমাহুল্লাহর এক শাগরিদ হযরতের জুব্বা নদীতে নিক্ষেপ করলেন। ফলে নদীর পানি শান্ত হলো। শাগরিদ জানালেন এরূপ অবস্থায় হযরতের জুব্বা নদীতে ফেলে দিতে তিনিই তাকে বলে রেখেছিলেন।[৫৫]

হযরত আবুল হাসান খারক্বানী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত আবুল হাসান খারক্বানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির স্ত্রী খুব কর্কষভাষী ছিলেন। একদিন কেউ একজন হযরতের বাড়িতে এসে ডাক দিলো, আবুল হাসান বাড়িতে আছেন? ঘরের ভেতর থেকে হযরতের স্ত্রী কর্কষ ভাষায় বললেন, "এই মিথ্যাবাদী ও মুনাফিকের সাথে তোমার কী দরকার আছে?" এরপর মহিলা আরোও জগন্য নেতিবাচক মন্তব্য করলেন নিজের স্বামীর ব্যাপারে। যাক, ঐ ব্যক্তি

[৫৫] তাযকিরাতুল আউলিয়া।

দ্রুত বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন এবং এক জঙ্গলে যেয়ে হযরত খারক্বানী রাহিমাহুল্লাহর সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি দেখলেন হযরত একটি সিংহের ওপর লাকড়ির আঁটি তুলে জন্তুটিকে নিয়ে হাঁটছেন। লোকটি তাঁকে বললেন, "হযরত! এখানে আপনাকে যে অবস্থায় দেখছি তার বিপরীত অবস্থা আপনার ঘরে বিরাজ করছে। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? তিনি বললেন, ঘরের ঐ জন্তুর [অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর] বোঝা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি টেনে ধরতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিংস্র সিংহকে পোষ মানাতে পারবে না।"

কথিত আছে, এরূপ স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কেনো ঘর-সংসার অব্যাহত রেখেছেন- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলতেন, "আমার অপর কোনো মুসলিম ভাই যাতে কষ্ট পায় না তাই আমি ওকে নিয়ে সংসার করে যাচ্ছি।"[৫৬]

ইব্রাহিম খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহ

একদিন হযরত খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর এক শাগরিদ নির্জন প্রান্তরে ভ্রমণে ছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহ গভীর মুরাক্বাবায় বসে ধ্যানস্থ হলেন। কিছুক্ষণ পর এক তাগড়া হিংস্র সিংহ তাঁর দিকে আসতে লাগলো। শাগরিদ ভয়ে নিকটস্থ একটি গাছে আরোহণ করলেন। সিংহ খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহর কাছে এসে চক্কর দিল, তারপর চলে গেলো। হযরত খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহ একটুকুও নড়লেন না- তিনি ধ্যানস্থ রইলেন।

এরপর পুনরায় উভয়ে চলতে থাকেন। এক পর্যায়ে একটি মশা এসে হযরতের গায়ে বসলো। তিনি সাথে সাথে নড়েচড়ে উঠলেন। মশা তাড়িয়ে দিলেন। শাগরিদ প্রশ্ন করলেন, "ইয়া শাইখী! একটি হিংস্র জন্তু আপনার নিকটে আসলো অথচ আপনি নড়লেনই না। এখন একটি মশা আসতেই আপনি একে তাড়া করলেন- এর কারণ কি?"

---

[৫৬] তাযকিরাতুল আউলিয়া।

তিনি জবাব দিলেন, "সিংহ আসার সময় আল্লাহর অনুগ্রহে আমি নফস থেকে পবিত্র হয়ে যাই। এখন আমি আমার নফসের মাঝেই আছি।"[৫৭]

মুমশাদ দিনাওয়ারী রাহিমাহুল্লাহ

তুমি যেখানে নেই সেখানে প্রভুর দরোজা: এক দরবেশ এসে হযরত দিনাওয়ারী রাহিমাহুল্লাহর নিকট আরয করলেন, "ইয়া শাইখী! অনুগ্রহ করে প্রভুর দরবারে আমার জন্য দু'আ করুন।" তিনি বললেন, "প্রভুর কক্ষের দরজায় সরাসরি চলে যাও এবং প্রার্থনা করো। আমার পক্ষ থেকে মধ্যস্থতার কোনো প্রয়োজন নেই।" দরবেশ প্রশ্ন করলেন, "প্রভুর দরোজাটি কোথায়?" তিনি বললেন, "যেখানে তুমি নেই সেখানে!"

এ কথা শুনে দরবেশ নির্জন এক জায়গায় একাকী আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করলেন।

একদা দিনাওয়ার শহরে বন্যা হলো। হযরত দিনাওয়ারী রাহিমাহুল্লাহ লক্ষ্য করলেন সেই দরবেশ একটি জায়নামাজে বসে পানির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছেন। তিনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "হে দরবেশ! তুমি এরূপ উচ্চ মাক্বামে কীভাবে আরোহণ করলে?" দরবেশ জবাব দিলেন, "প্রভুর অনুগ্রহ ও আপনার উপদেশ অনুসরণের কারণে এমনটি হয়েছে।"[৫৮]

একদিন তিনি তাঁর হুজরাহ থেকে বের হয়েছেন মাত্র। কোত্থেকে এক কুকুর আসে তাঁকে ঘিরে ফেললো। কুকুরটি বার বার ঘেউ ঘেউ করছিলো। মুমশাদ রাহিমাহুল্লাহ সরবে বললেন, "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ"। আশ্চর্যের ব্যাপার কুকুরটি সাথে সাথে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে মারা গেলো।[৫৯]

---

[৫৭] তাযকিরাতুল আউলিয়া।

[৫৮] প্রাগুক্ত।

[৫৯] জামে' কারামাতুল আউলিয়া।

আবু আলী দাক্কাক রাহিমাহুল্লাহ ও এক দরবেশ

একদিন হযরত আবু আলী দাক্কাক রাহিমাহুল্লাহর দরবারে এক দরবেশ এসে হাজির হলেন। আবদার করলেন, হযরত! আমাকে একটু জায়গা দিন যেখানে মরতে পারি! দাক্কাক রাহিমাহুল্লাহ নিজের কক্ষের এক কোণায় যেতে বললেন। দরবেশ সেখানে যেয়ে আল্লাহর জিকির করতে লাগলেন। দাক্কাক রাহিমাহুল্লাহ একটু দূরে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দরবেশের কার্যকলাপ অবলোকন করছিলেন।

এক পর্যায়ে দরবেশ বললেন, দাক্কাক! আমাকে অন্যমনস্ক করবেন না। আবু আলী একথা শুনে লুকিয়ে থাকার স্থান থেকে সামনে বেরিয়ে আসলেন। এরপর লক্ষ করলেন, দরবেশ স্বরবে আল্লাহর জিকির করতে করতে সত্যিই মারা গেলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মহূর্তের মধ্যে দরবেশের লাশ গায়েব হয়ে গেলো। তিনি আল্লাহর দরবারে আবদার জানালেন, হে আল্লাহ! এ দরবেশের লাশটি কোথায় গেলো- আপনিই আমাকে বলে দিন। এক আওয়াজ তাঁর কর্ণগোচর হলো: “তাঁকে খোঁজ করো না। মৃত্যুর ফিরিশতা এবং বেহেশতের ফিরিশতারাও তাঁকে খোঁজে পায় নি।” তিনি আবার বললেন, “হে প্রভু! তাহলে দরবেশের লাশ কোথায় গেলো?” জবাব আসলো, “সে হাক্বিক্বাতের নৈকট্যে পৌঁছুয়ে গেছে। পৌঁছুয়ে গেছে মহাশক্তিধর বাদশাহের দরবারে।”[৬০]

আবুল ফজল হাসান সাররাখশী রাহিমাহুল্লাহ

বিখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত আবু সাঈদ আবুল খাইর রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ ছিলেন হযরত আবুল ফজল হাসান সাররাখশী রাহিমাহুল্লাহ। একদিন তিনি একটি বৃক্ষের নিচে বসে প্রার্থনা করছিলেন মহাপ্রভুর দরবারে: “হে প্রভু! গত এক বছর যাবৎ আমি একটি মাত্র দিনার চাচ্ছিলাম যাতেকরে মাথার চুল মুণ্ডন করতে পারি। কিন্তু আমি এখনও ঐ দিনার পাওয়া থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলাম।” তাঁর কথাগুলো

[৬০] তাযকিরাতুল আউলিয়া।

ইমাম কিরমানী রাহিমাহুল্লাহ লুকিয়ে থেকে চুপিচুপি শুনছিলেন। তিনি দেখলেন, সাররাখশী রাহিমাহুল্লাহর কথাগুলো শেষ হতেই বৃক্ষের প্রতিটি পত্র স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেলো। সাররাখশী রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “হে আমার প্রভু! আমি আর কেনোদিন নিজের সমস্যার কথা আপনার দরবারে পেশ করবো না।”[৬১]

হাসান মিসরী রাহিমাহুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো, মুহাম্মদ ইবনে হাসান মুনির সামানুদী মিসরী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি মিসরের অধিবাসী ছিলেন। একদিন তাঁর গ্রামের লোকজন একটি কূপ খনন করছিলো। অনেক গভীর পর্যন্ত খনন করার পরও পানির সন্ধান মিললো না। অবশেষে তারা ছুটে এলো হাসান মিসরী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে। আবদার জানালো, “হে শায়খ! আপনি অনুগ্রহ করে কূপের পাশে দাঁড়িয়ে প্রভুর দরবারে দুআ করুন।” শায়খ তাদের আবদারে সাড়া দিয়ে কূপের নিকট চলে আসলেন। তিনি স্বরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন ও আল্লাহর দরবারে দুআ করে বললেন, “তোমরা আরো একটু খনন করো।” আল্লাহর কী কুদরত! সামান্য খনন করার পরই প্রচণ্ড বেগে পানি উঠতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে কূপটি ভরে গেলো সুস্বাদু মিঠাপানিতে।[৬২]

মুহাম্মদ সিবগাতুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ

একদিন হযরত শায়খ মুহাম্মদ সিবগাতুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহর দরবারে এক ফকির এসে বললো, “হুজুর! আমি গরীব মানুষ। দয়া করে কিছু দান করুন।”

---

[৬১] প্রগুক্ত।

[৬২] তাযকিরাতুল আউলিয়া।

হযরতের নিকট দেবার মতো কিছুই ছিলো না। তিনি নিকটস্থ একটি ছোট্ট পাথরের দিকে তাকালেন। আল্লাহর কী কুদরত! পাথরটি স্বর্ণে পরিণত হয়ে গেলো। তিনি হাতে তুলে ফকিরকে দিয়ে দিলেন।[৬৩]

মুহাম্মদ কিন্দী খালওয়াতি শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ

হযরত কিন্দী রাহিমাহুল্লাহর এক বিশেষ কারামত ছিলো। যখনই তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার ইচ্ছা করতের তখনই তিনি নিয়ত করে ঘুমুতেন। আল্লাহর অনুগ্রহে স্বপ্নযোগে হুজুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে জিয়ারত নসিব হতো।[৬৪]

আবু আলী ক্বাদরী রাহিমাহুল্লাহ

শায়খ আবু আলী ক্বাদরী রাহিমাহুল্লাহর এক পুত্রসন্তান ছিলেন। ছেলেটির মা একদা আগুন নিয়ে আসার জন্য তাকে পড়শির বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তবে আগুন আনার জন্য সে কিছুই সাথে নেয় নি। পড়শি মহিলার নিকট আগুন নিয়ে যাওয়ার কথা বললো। মহিলা বললেন, “তুমি তো শায়খ ক্বাদরীর ছেলে- তাই না? তোমার দাদা আব্দুল ক্বাদির খুব বড় মাফের ওলি ছিলেন। তুমি যদি হাতের মুঠোয় আগুন নিতে চাও তাহলে তা পারবে বলে আমি মনে করি। তোমার হাত জ্বলবে না। ছেলেটি তার হাত প্রসারিত করলো। মহিলা তার হাতে আগুন দিলেন। ছেলে মুষ্ঠিবদ্ধ অবস্থায় মায়ের নিকট ফিরে এলো। সত্যিই দেখা গেলো আগুন হাতের মধ্যে জ্বলন্ত আছে।

---

[৬৩] জামি’ কারামাতুল আউলিয়া- ইউসুফ ইবনে ইসামাঈল নাবহানী এবং আবদুল ওয়ারিস মুহাম্মদ আলী।
[৬৪] প্রাগুক্ত।

শায়খ আবু আলী ক্বাদরী রাহিমাহুল্লাহ এ ঘটনা শুনে রাগান্বিত হলেন। এভাবে কোনো কারামত দেখানো সঠিক হয় নি- একথা বলে ছেলের মাকে তিরস্কার করলেন।[৬৫]

মুহাম্মদ ইবনে উমর রাহিমাহুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমর নাহারী ইয়ামনী। যে কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আসতো তিনি তার নাম, পিতার নাম ও মাতার নাম বলে দিতে পারতেন। তিনি এটাও বলে দিতেন কোন শহর বা গ্রাম থেকে তারা এসেছে।

একদা বেশ কয়েক ব্যক্তি দল বেঁধে হযরত উমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। এদের একজন নিজের পরনের কাপড় খুলে পাথরের নিচে লুকিয়ে রেখে বললো, "আমি হযরতের নিকট পরনের কাপড় দিতে আবদার জানাবো। এটাও বলবো, আমার পরনের কাপড় নেই।" হযরতের দরবারে উপস্থিত হয়ে ঐ লোকটি ঠিকই বললো, তার পরনের কাপড় নেই। সে কাপড় চাইলো। শায়খ জবাব দিলেন, "এরূপ মিথ্যা কথা বলে তুমি কী অর্জন করতে চাও? তোমার কাপড় তো একটি পাথরের নিচে রেখে এসেছো!" শায়খ তাঁর খাদিমকে বললেন, অমুক স্থানে যেয়ে পাথরের নিচ থেকে এ ব্যক্তির কাপড় নিয়ে আসো। খাদিম কাপড় নিয়ে এসে সবার সম্মুখে হাজির করলো।[৬৬]

মুহাম্মদ ইবনে দাউদ মাতারলাদী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত মাতারলাদী রাহিমাহুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতে আসতো লোকজন বাদ ইশা। ঘরে খাবার কিছু না থাকলে তিনি পাত্রভর্তি পানি জাল দিতেন। আল্লাহর কুদরতে

---

[৬৫] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

[৬৬] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

পাত্র দুধ, মিষ্টি ভাত না হয় মুরগির ও খাসির মাংসে ভরে যেতো। এর দ্বারা তিনি সবাইকে আপ্যায়ন করাতেন।[৬৭]

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদীর রাহিমাহুল্লাহ

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদীর রাহিমাহুল্লাহর পুত্র বর্ণনা করেন: ইয়ামন থেকে এক ব্যক্তি আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ৮০ দিনার আমার পিতার নিকট আমানত রাখলেন। এরপর বললেন, হযরত! আমি জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য চলে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিতে আপনার প্রয়োজন হলে এই টাকা খেরচ করতে পারবেন। এরপর লোকটি চলে গেলেন।

লোকটি জিহাদে থাকতে মদীনায় নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। মানুষ ভীষণ কষ্টে পড়ে যায়। সুতরাং আমার পিতা ঐ ৮০ দিনার গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

কিছুদিন পর ইয়ামনী ব্যক্তি ফিরে এসে তার দিনারগুলো ফেরৎ দিতে আবদার জানালো। পিতাজী বললেন, "আপনি আগামীকাল আসবেন।" এরপর আমার পিতা মসজিদে নববীতে চলে গেলেন। রাতের বেলা তিনি দীর্ঘক্ষণ পবিত্র রওজা মুবারকের পাশে বসে ইবাদতে মশগুল হলেন। এরপর মিম্বরে যেয়ে ধ্যান-মুরাক্বাবায় বসে গেলেন। ভোর পর্যন্ত এভাবেই সময় কাটালেন। এরপর কোত্থেকে এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে এসে হাজির হলেন। বললেন, "হে মুহাম্মদ! এটা গ্রহণ করুন।" তিনি পিতাজীর হাতে একটি থলে তুলে দিলেন। থলের মধ্যে ছিলো ৮০ দিরহাম। এরপর ইয়ামনী লোকটি আসার পর তার আমানত ফেরৎ দিলেন।[৬৮]

[৬৭] প্রাগুক্ত।

[৬৮] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

হাসান আহীমী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত হাসান আহীমী রাহিমাহুল্লাহ কোনো এক রাত স্বপ্নযোগে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে একটি রুটি তুলে দিলেন। তিনি অর্ধেক রুটি ভক্ষণ করলেন ও বাকি অর্ধেক রেখে দিলেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর লক্ষ্য করলেন ঐ অর্ধেক রুটি তার পাশেই পড়ে আছে।[৬৯]

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ বূলাগী রাহিমাহুল্লাহ

একদা এক মহিলা তার সন্তানসহ সাগরতীরে বেড়াতে গেলেন। সেখানে ইথিওপিয়াগামী একটি জাহাজ ছিলো। এক ব্যক্তি মহিলার সন্তানকে ধরে নিয়ে গেলো এবং ঐ হাজাজে আরোহণ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ ছেড়ে দিলো।

পুত্রকে হারিয়ে মহিলা কাঁদতে কাঁদতে হযরত বূলাগী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত তখন নামায সেরে আসছিলেন। মহিলা সব কথা খুলে বললেন ও সন্তানকে ফিরে পেতে হযরতের নিকট আবদার জানালেন।

শায়খ বূলাগী সাগর পারে চলে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, "হে বাতাস! থেমে যাও!" আল্লাহর ইচ্ছায় সত্যিই বাতাস থেমে গেলো। ইথিওপিয়াগামী (পালের) জাহাজটিও অগ্রসর হতে পারলো না। শায়খ চিৎকার দিয়ে বললেন, "এই জাহাজে একটি ছেলে আছে যাকে কেউ একজন ধরে নিয়ে গেছে। এই বালককে তার মায়ের নিকট ফেরৎ দাও।" জাহাজের কাপ্তান হযরতের কথায় কান না দিয়ে জাহাজ তীর ভিড়ালো না। হযরত চিৎকার দিলেন, "হে জাহাজ! থেমে যাও!" সত্যিই জাহাজটি আর একটু অগ্রসর হতে পারলো না। শায়খ বূলাগী পানির ওপর

---

[৬৯] প্রাগুক্ত।

দিয়ে হেটে জাহাজে উঠে গেলেন। ছেলেকে নিয়ে পুনরায় পানির ওপর দিয়ে হেটে তীরে আসলেন ও ক্রন্দনরত মায়ের কোলে সন্তানকে তুলে দিলেন।[৭০]

মুহাম্মদ সদরুদ্দিন মুবাকরী রাহিমাহুল্লাহ

পবিত্র হজ্জ পালন করে হযরত মুবাকরী মদীনা মুনুওয়ারায় গেলেন জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। তাঁর সাথীরা বর্ণনা করেন, হযরত রওজা মুবারকের সামনে যেয়ে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ!" কবর শরীফ থেকে সালামের জবাব আসলো, "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া উম্মাতী"। এই জবাব আশ-পাশ সবাই শুনতে পেলেন।[৭১]

ইবনে ঈসা জাইলায়ী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত ঈসা জাইলায়ী রাহিমাহুল্লাহ একটি মসজিদের নির্মাণকাজ করাচ্ছিলেন। হঠাৎ একব্যক্তি বেশ উঁচু থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। এতে তার গর্ধনা ভেঙ্গে পড়লো। লোকজন এ মেস্তুরিকে নিয়ে গেলো হযরতের দরবারে। তিনি কিছু পাঠ করে কাঁধের মধ্যে ফুৎকার দিলেন। আল্লাহর কী মহিমা! সাথে সাথে লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো।[৭২]

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মা'রুফ রাহিমাহুল্লাহ

হযরত মুনাদি বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ মা'রুফের একটি বিশেষ কারামত ছিলো। যখনই তিনি গোসল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন আর পানি পাওয়া কঠিন হয়ে উঠতো তখন তিনি বাইরে যেয়ে দাঁড়াতেন। এরপর দেখা

---

[৭০] প্রাগুক্ত।

[৭১] প্রাগুক্ত।

[৭২] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

যেতো কোত্থেকে একটি মেঘমালা এসে বৃষ্টি দিচ্ছে। তিনি এতে গোসল সেরে নিতেন।[৭৩]

মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ হযরত ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র ছিলেন। কোনো একদিন মাংস কিনে আনতে একটি কসাইর দোকানে গেলেন। কসাই শায়খকে উপেক্ষা করে চলে গেলো। সাথে সাথে কসাইয়ের একটি হাত অবশ হয়ে গেলো। সে আর মাংস কাটতে পারছিলো না। সে শায়খ হুসাইনের সাথে বেআদবি করেছে, এ ব্যাপারটি তার নিকট ধরা পড়তেই ছুটে গেলো শায়খের নিকট। কেঁদে কেঁদে বললো, "হে শায়খ! আমার ভুলের জন্য আপনি আমাকে দয়া করে ক্ষমা করুন। আমি আল্লাহর দরবারেও তাওবাহ করেছি। অনুগ্রহ করে আমার জন্য দু'আ করুন যাতেকরে আমার হাতের অবশতা দূর হয়ে যায়।

শায়খ আবু আবদুল্লাহ কসাইকে ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহর দরবারে তার জন্য দু'আ করলেন। সাথে সাথেই কসাইয়ের হাতের অবশতা দূর হয়ে গেলো।[৭৪]

আবু বকর মুহাম্মদ মালিকী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত আবু বকর মালিকী রাহিমাহুল্লাহ একদিন এক মহিলার পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। মহিলা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মহিলা তাঁকে দেখে ফকিরদের মতো আবদার জানালো, "হুজুর! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে কিছু দান করুন।" তিনি বললেন, "মাগো! আমার নিকট দুনিয়ার কোনো বস্তু নেই যা তোমাকে দিতে পারি। তবে তোমার হাতটি আমার দিকে প্রসারিত করো।"

---

[৭৩] প্রাগুক্ত।

[৭৪] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

আশ্চর্যের বিষয়, মহিলা হাত বের করতেই সম্পূর্ণ সুস্থ অনুভব করলেন। তার পক্ষাঘাত রোগটি চলে গেছে! তিনি দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলো। মহিলা আনন্দে আত্মহারা! এদিকে হযরত মালিকী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গন্তব্য স্থানের দিকে চলে গেলেন।[৭৫]

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল মাগরিবী রাহিমাহুল্লাহ

তিনি ছিলেন ইব্রাহিম খাওয়াস রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ ও তরিকতের শায়খ। হযরত ইসমাঈল রাহিমাহুল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেন, আমি কখনও রাতের অন্ধকার চোখে দেখি নি। রাত ও দিন আমার নিকট সমান ছিলো। সুতরাং রাতের সফরকালে সফরসঙ্গীদের নিয়ে তিনি দ্রুত হেঁটে যেতেন। তিনি সর্বদা সবার সামনে থাকতেন।[৭৬]

খাইরুন নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহ

বিখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত খাইরুন নাসসাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি কারামত সম্পর্কে সবাই বলাবলি করতো। একদা এক ব্যক্তি তাঁর নিকটে এসে সকাতরে আরজ করলো, "ইয়া শায়খ! গতকাল আপনাকে বাজারে দেখলাম সূতা বিক্রি করছেন। আপনাকে একব্যক্তি সূতার বদলে দুইটি দিরহাম দিলেন। আপনি দিরহামগুলো পকেটে রাখার পর আমি চুরি করে নিয়ে যাই। কিন্তু হযরত, সেই থেকে আমার হাতের মুষ্টি খুলতে পারছি না। আমি তাই ছুটে এসেছি আপনার নিকট ক্ষমা চাইতে। অনুগ্রহ করে আমাকে মাফ করুন ও এ অবস্থা থেকে রেহাই দিন।"

হযরত নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহ চোরের আবদার শুনে মুসকি হাসি দিয়ে নিজের হাত তার মুষ্টিবদ্ধ হাতের নিকটে নিলেন। সাথে সাথে তার হাত খুলে গেলো। একই

---

[৭৫] প্রাগুক্ত।

[৭৬] প্রাগুক্ত।

সাথে দিরহাম দুটো হযরত নাসসাজের হাতে আসলো। তিনি পুনরায় দিরহাম দুটো চোরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "যাও! এ টাকা দিয়ে নিজের পরিবারের জন্য কিছু ক্রয় করো। আর কোনোদিন এভাবে চুরিও করবে না।"[৭৭]

আবু আবদুল্লাহ বসরী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত আবুল ফজর বাগদাদী বর্ণনা করেন, আমি একদিন হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বসরী রাহিমাহুল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত ছিলাম। একজন মহিলা তাঁর নিকট আসলো। সে বললো, "হযরত! আমার মোহর সিদ্ধান্তের সময় আপনি সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত লিখিত প্রমাণটি আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি আপনার নিকট আবদার জানাচ্ছি, দয়াকরে আমার সাথে সাক্ষী হিসেবে আদালতে চলুন।"

তিনি বললেন, "তুমি আমাকে মিষ্টি না দেওয়া পর্যন্ত আমি যাবো না।" একথা শুনে মহিলা ভাবলো, হযরত বুঝি মশকরা করছেন। কিন্তু তিনি পুনরায় বললেন, মিষ্টি না দিলে আমি যাবো না। মহিলা চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে মহিলা ফিরে আসলেন। তার পকেট থেকে কাগজে মুড়ানো একটি শুকনো মিষ্টি মাংস বের করলেন। তিনি তা হযরত বসরী রাহিমাহুল্লাহর হাতে তুলে দিলেন। উপস্থিত সবাই তাঁর কার্যকলাপে আশ্চর্য বোধ করলেন। সবাই দেখতে থাকেন। মিষ্টি হাতে নেওয়ার পর উপস্থিত সবার মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। এরপর যে কাগজে মিষ্টি মুড়ানো ছিলো সেটি পাঠ করতে করতে বললেন, "এই তো তোমার হারানো কাবিননামা!" উপস্থিত সবাই এ কারামত দেখে অবাক হয়ে গেলো।[৭৮]

---

[৭৭] জামে' কারামাতুল আউলিয়া।

[৭৮] জামে' কারামাতুল আউলিয়া।

আশরাফ রান্দী রাহিমাহুল্লাহ

একদিন হযরত আশরাফ রাহিমাহুল্লাহর এক ভক্ত তাঁকে দাওয়াত দিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলো। লোকটির ইচ্ছে ছিলো, হযরতের কোনো একটি কারামত দেখবে।

সে সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও মেজবান ঘরের ভেতর বাতি জ্বালালেন না। হযরত আশরাফ রাহিমাহুল্লাহ একগাছি ঘাঁস হাতে তুলে নিলেন। নিজের একটি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। ঘাসের মধ্যে আগুন ধরে গেলো। বললেন, "এই নাও বাতি"। লোকটি অবাক হলো। সে ঐ আগুন দ্বারা মোমবাতি জ্বালালো। হযরত আশরাফ রাহিমাহুল্লাহর আরেকটি কারামত ছিলো, আগুনে তাঁর শরীর জ্বলতো না। প্রায়ই তিনি আগুনের মধ্যে হাত রাখতেন কিন্তু এতে তাঁর কোনো ক্ষতি হতো না।[৭৯]

ইসমাঈল সুফি বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল সুফি বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ ইবনে সা'মূন নামেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একদিন বাইতুল মুক্বাদ্দিসের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে যান। তাঁর সাথে কিছু শুকনো খেজুর ছিলো। এক জায়গায় বিরতি থাকাকালে তাঁর মন চাইলো, আহ্ যদি কিছু তাজা খেজুর থাকতো।

ইফতারের সময় আসতেই তিনি থলে খুললেন শুকনো খেজুর বের করতে। কিন্তু কী আশ্চর্য! তিনি দেখলেন থলের ভেতর তরতাজা খেজুর! তিনি এগুলো ভক্ষণ করলেন না। পরের দিন ইফতারের সময় থলের ভেতর ঠিকই শুকনো খেজুর ছিলো।

অন্য আরেকদিন ইবনে সা'মূন রাহিমাহুল্লাহ কেনো এক স্থানে ওয়াজ করছিলেন। আবদুল ফাতাহ ক্বাওয়াস নামক এক ব্যক্তি কক্ষের দরোজার নিকট

---

[৭৯] জামে' কারামাতুল আউলিয়া।

বসা ছিলেন। তার চোখে ঘুম এসে গেলো। তিনি তন্দ্রাভিভুত হলেন। এদিকে কিছুক্ষণ ওয়াজ করে ইবনে সা'মূন রাহিমাহুল্লাহ থেমে গেলেন।

এরপর আবদুল ফাতাহ ক্বাওয়াসের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। হযরত ইবনে সা'মূন রাহিমাহুল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কী হে, তুমি বুঝি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখছিলে?" আবদুল ফাতাহ জবাব দিলেন, "ঠিকই বলেছেন হযরত, আল্লাহর অনুগ্রহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নসিব হয়েছে।" ইবনে সা'মূন রাহিমাহুল্লাহ বললেন, "এ কারণেই আমি ওয়াজ বন্ধ করেছিলাম। ভাবলাম, তোমার স্বপ্নে ব্যঘাত ঘটতে পারে।"

হযরত ইবনে সা'মূন রাহিমাহুল্লাহ ৩৮৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর ৩৩ বছর পর তাঁর মরদেহ অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। সবাই দেখলেন তাঁর কাফন পর্যন্ত নতুন ছিলো।[৮০]

আবু আবদুল্লাহ কুরাইশী হাশিমী রাহিমাহুল্লাহ

এই মহাত্মন ওলিআল্লাহর পূর্ণ নাম ছিলো মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইব্রাহিম আবু আবদুল্লাহ কুরাইশী হাশিমী রাহিমাহুল্লাহ। হযরত শাইরানী বর্ণনা করেন, তিনি সকল মুরিদানকে বলতেন, ঘরের মধ্যে একটি মাত্র তরকারী রান্না করবে।

একদিন তাঁর এক মুরিদ স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ তুমি কী রান্না করবে বলো, আমি নিয়ে আসবো।" স্ত্রী বললেন, "আপনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন। সে যেটা বলবে তাতেই আমি রাজি।" মুরিদ মেয়েকে প্রশ্ন করলে পরে সে বললো, "আজ আপনি কি খাবেন বলুন? কারণ আমি যা চাইবো তা আপনি এনে দিতে পারবেন না।" মুরিদ বললেন, "প্রিয় মেয়ে! তুমি যা চাও তার দাম যদি হাজার দিরহামও হয় আমি অবশ্যই এনে দেবো।" মেয়ে বললো, "আমি কিছু চাই না

---

[৮০] জামে' কারামাতুল আউলিয়া।

একটি মাত্র আবদার ছাড়া- আপনি আমাকে কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করুন!”

উল্লেখ্য মহাত্মন ওলিআল্লাহ কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহ তখন অন্ধ ও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন। কোনো মহিলা তাঁকে বিয়ে করবে তা ছিলো চিন্তাতীত। মুরিদ নিজের মেয়ের আবদার নিয়ে কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। সব শুনে কুরাইশী বললেন, “কাজিকে ডেকে আনো।” কাজি আসার পর যথারীতি বিবাহ হয়ে গেলো মুরিদের মেয়ের সাথে।

বাসর রাতে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেলো। শায়খ কুরাইশী বাথরুমে যেয়ে মুখ-হাত দৌত করে বাসর ঘরে প্রবেশ করলেন। মুরিদের মেয়ে- শায়খের স্ত্রী তাড়াহুড়ো করে নিজের মুখ ঢেকে দিলেন। তিনি দেখলেন অপূর্ব সুন্দর এক যুবক তার কক্ষে ঢুকে গেছেন। নিজের স্বামী তো ঐ যুবকের মতো নয়- তাই তিনি বেগানা পুরুষ কক্ষে ঢুকেছে মনে করে পর্দা করলেন লজ্জায়।

এদিকে শায়খ কুরাইশী বললেন, “কী হয়েছে? আমিই তো আবদুল্লাহ কুরাইশী! তোমার স্বামী।” মেয়ে বললেন, “না, না- আপনি শায়খ কুরাইশী নন। তিনি তো অন্ধ এবং কোষ্ঠরোগি!” শায়খ বার বার বললেন, তিনিই কুরাইশী। এরপর মেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “এ কোন্ অবস্থা?” তিনি বললেন, “অন্যান্য সবাই আমাকে আমার আসল চেহারায় দেখবে। শুধু তুমি দেখবে এই চেহারায় যা তুমি দেখতে পাচ্ছো এই মুহূর্তে। তবে শর্ত হচ্ছে আমার মৃত্যুর পূর্বে এ কারামতের ব্যাপারটি তুমি কারো নিকট বলবে না।”

স্ত্রী রাজি হলেন। এরপরও বললেন, “আপনার আসল চেহারা দেখলেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি তো এসেছি আপনার খিদমাত করতে। বরং আপনার আসল চেহারাই আমার নিকট আরো প্রিয়।” একথা শুনে শায়খ কুরাইশী আনন্দিত হয়ে বললেন, “আল্লাহ তোমাকে উত্তম যাজা দিন। এখন থেকে আসল চেহারায়ই আমাকে দেখবে।”

হযরত মুনাদি বলেন, “নামায আদায়কালে কুরাইশী রাহিমাহুল্লাহ সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতেন।”[৮১]

রিসলান মিসরী রাহিমাহুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে রিসলান মিসরী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি দর্জির কাজ করতেন। তাঁর একটি বিশেষ কারামত ছিলো এই: কেউ যখন জামা নিতে আসতো তখন আসল দিরহাম দিলে জামার কলার খুলে যেতো। অন্যতায় তা বন্ধ হয়ে যেতো। আসল দিরহাম নিয়ে তার কাছে এসে পরিশোধ না করা পর্যন্ত জামার কলার খুলতো না।[৮২]

ইমরান আয়াশী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইমরান আয়াশী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ কফিনে ভরে কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আযান শুরু হতেই কফিন ভীষণ ভারী হয়ে ওঠলো। লোকজন বাধ্য হয়ে কফিন মাটিতে রাখলেন। আযান শেষ হওয়ার পর দেখা গেলো কফিন আগের মতো পাতলা হয়েছে। লোকজন পুনরায় কাঁধে তুলে কফিনটি কবরস্থানের দিকে নিয়ে চললো।

এ আশ্চর্য ঘটনার কারণ জানা গেলো হযরতের খাদিমের কাছ থেকে। খাদিম, বলেন, যখনই আমার শায়খ আযান ধ্বনি শুনতেন তখনই তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং আযানের জবাব দিতেন। যে সময় যেখানে থাকতেন সেখানেই দাঁড়িয়ে

[৮১] প্রাগুক্ত।

[৮২] প্রাগুক্ত।

যেতেন আযানের জবাব দিতে- কখনও এর ব্যতিক্রম হতো না। সুতরাং বুঝা গেলো মৃত্যুর পরও তাঁর এ অভ্যেসের হেরফের হয় নি।[৮৩]

মুহাম্মদ সিক্বাবিয়া রাহিমাহুল্লাহ

হযরত মুহাম্মদ সিক্বাবিয়া রাহিমাহুল্লাহ একজন কারামতওয়ালা বুজুর্গ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। একদিন তাঁর এক দুশমন দেশের বাদশার সম্মুখে তাঁর বিরুদ্ধে কঠুকথা বললো। বাদশাহ মশকরা করে ২টি বাক্স ভর্তি মদ সিক্বাবিয়া রাহিমাহুল্লাহর নিকট প্রেরণ করলেন। শায়খ বাক্স দুটো গ্রহণ করে নিজের এক সাথীকে খুলতে বললেন। তাঁর এক শাগরিদ এ কাজ পছন্দ করলেন না। কারণ বুঝাই যাচ্ছিলো বাক্সের ভেতর মদ আছে। তিনি মন্তব্য করলেন, আমাদের নামাযের স্থানে এগুলো খুললে বেআদবি হবে। শায়খ বললেন, কোনো ক্ষতি হবে না। আগে খুলে দেখো এতে কী আছে।

বাক্সগুলো খুলে দেখা গেলো একটির ভেতর উত্তম মধু ও অপরটির মধ্যে আছে উত্তম ঘি। যে ব্যক্তি বাক্স নিয়ে এসেছিলো সে-ও উপস্থিত ছিলো। মদের বোতলে মধু ও ঘি দেখে সে একরূপ অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তার হুঁশ ফিরে আসার পর শায়খ সিক্বাবিয়া ককেকটি বোতল ভর্তি মধু ও ঘি তার হাতে দিয়ে বললেন, যাও, এগুলো মহামান্য বাদশাহকে আমার পক্ষ থেকে উপহার দেবে।[৮৪]

মুহাম্মদ সাহিব মুরবাত রাহিমাহুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো মুহাম্মদ আলী ইবনে মুহাম্মদ সাহিব মুরবাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হযরতের আফরিকা নিবাসী এক মুরিদ ছিলেন। মুরিদ কোনো ভ্রমণে থাকাকালে তার পরিবারবর্গের নিকট সংবাদ আসলো তিনি মারা গেছেন।

[৮৩] প্রাগুক্ত।

[৮৪] জামি’ কারামাতুল আউলিয়া।

শোকসন্তপ্ত পরিবারের একজন সদস্য হযরত মুরবাত রাহিমাহুল্লাহর নিকট এ দুঃসংবাদ নিয়ে আসলো। হযরত কিছুক্ষণ মাথা নত করে বসে রইলেন। এরপর বললেন, "তিনি মারা যান নি।" সংবাদদাতা বললো, "হযরত! আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তিনি মারা গেছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের নিকট খবর এসছে।"

হযরত বললেন, "দেখুন, আমি জান্নাতের সর্বত্র তার সন্ধান করে দেখলাম সে ওখানে নেই। আর আমার মুরিদ কখনও দোযখে যাওয়ার কথা নয়।" কিছুদিন পর জানা গেলো, সত্যিই মুরিদ মারা যান নি। তিনি পরিবারবর্গের কাছে ফিরে আসলেন।

অন্য আরেকদিন শায়খ মুরবাত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, বাগদাদ শহর বন্যায় আক্রান্ত হবে। কিছুদিন পর দজলা নদীর পানি বাড়তে বাড়তে শহরে প্রবেশ করলো। শহরের প্রশাসক, খলিফা, বাইতুল মালের কক্ষ এবং আরো ৩৩০টি বাড়ি বন্যায় ভেসে যায়। বন্যার পানিতে অনেক লোকের সলিল সমাধিও হয়েছে।[৮৫]

সালেহ ইবনে আবিল হাসান রাহিমাহুল্লাহ

শায়খ সালেহ আবিদ ইবনে আবিল হাসান রহিমাহুল্লাহ নিজেই বলেন, এক বছর পিতা-মাতার সঙ্গে আমি হজ্জের উদ্দেশ্য যাত্রা করলাম। আমরা যখন আরব ভূমিতে প্রবেশ করি তখন এক রাতে কাফেলা চলছিলো যখন আমি বেশ ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আমি এক প্রান্তে চলে গিয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবো। এরপর পুনরায় যাত্রা শুরু করে কাফেলার নিকট পৌঁছাবো।

আমার ঘুম এসে গেলো। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন সূর্য উঠে গেছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না কোন্ দিকে কতদূর যেয়ে কাফেলাকে পাবো। আমি চিন্তিত হলাম- আরো চিন্তিত হলার পিতা-মাতার কথা ভেবে। তাদের দেখাশুনার মতো কেউ ছিলো না। এসব ভাবনা আমাকে আড়ষ্ঠ করে নিলো। কী করবো না বুঝতে পারলাম না।

---

[৮৫] প্রাগুক্ত।

আমি কাঁদতে লাগলাম। ক্রন্দনরত অবস্থায় আমি এক গায়েবি আওয়াজ শুনলাম, "তুমি কী আবু বকর ইনবে কুয়াম এর সঙ্গী নও?" বললাম, "জি হ্যাঁ, আমি তাঁর সঙ্গী।" কণ্ঠ আমাকে বললো, "তুমি আল্লাহর নিকট দু'আ করো। তোমার দু'আ কবুল হবে।"

আমি নির্দেশমতো নামাযে দাঁড়ালাম। নামায শেষে দু'আ করলাম। দেখলাম এক ব্যক্তি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, "চিন্তা করো না।" এরপর আমার হাতে ধরলেন। কিছুক্ষণ আমাকে নিয়ে হাঁটার পর বললেন, "এই উটটি তোমার মা-বাবার।" সামনেই উটটি ছিলো। আমি শুনলাম পিতা-মাতা আমার জন্য কাঁদছেন। আমি ছুটে গেলাম তাদের নিকট। সমস্ত ব্যাপার খুলে বললাম। তারা কথাগুলো শুনে অবাক হলেন।

কোনো এক দিন শায়খের মজলিসে এক সিপাহী উপস্থিত হয়ে বললো, "ইয়া শায়খ! আমার একটি খচ্চর ছিলো। তার পিঠে বহন করছিলো ৫০০০ দিরহাম। কিন্তু খচ্চরটি হারিয়ে গেছে। লোকজন আমাকে আপনার নিকট আসতে বলেছে। দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।"

লোকটিকে বসতে বলে শায়খ হাসান বললেন, "আমি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে দেখেছি। তোমার খচ্চর যে নিয়ে গেছে, সে এ বাড়ির দরোজা ছাড়া আর কোথাও যেতে পারবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে খচ্চরসহ এদিকে আসবে। আসার পর আমি তোমাকে অবগত করবো, তুমি তার হাত থেকে তোমার সম্পদ ছিনিয়ে আনবে।

এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, শায়খের কথা শুনে আমিও ঐ লোকটি আসার অপেক্ষা করতে থাকি। এরপর সত্যিই ঐ লোকটি খচ্চরসহ এসে গেলো। শায়খ সিপাহীকে ইশারা করলেন। সে ছুটে যেয়ে লোকটির নিকট থেকে তার খচ্চর নিয়ে আসলো। তার ৫০০০ দিরহাম পুরোটাই ফেরৎ পেলো।[৮৬]

---

[৮৬] প্রাগুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উস্তাজ আযম রাহিমাহুল্লাহ

হযরত আযম রাহিমাহুল্লাহর ফাতিমা নাম্নী এক বোন ছিলেন। তার একটি গাভি ছিলো। শহরের শাসক একদিন তার এ গাভিটি নিয়ে গেলেন। শায়খ আযম এ দুঃসংবাদ শুনে যেখানে গাভি রাখা ছিলো সেখানে চলে গেলেন। তিনি কক্ষের দেওয়ালের নিকট দাঁড়িয়ে কী একটা পাঠ করলেন। সাথে সাথে দেওয়ালটি ধ্বসে পড়ে গেলো। গাভিটি তখন ফাতিমার নিকট ফিরে আসলো।[৮৭]

আবি শায়বা হাজরামী রাহিমাহুল্লাহ

এই ওলির পুরো নাম ছিলো আবি আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া খাওনাস আবি শায়বা হাজরামী রাহিমাহুল্লাহ। শায়খ হাজরামী শরীয়তের ওপর বড়ো আলিম ছিলেন। তিনি যুগের এক বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন। অনেক ছাত্র তাঁর দরসে উপস্থিত থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। জুনদি নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, হযতের একজন ছাত্র একদা আমাকে বললেন, তাঁর দারসে যোগ দিতে। সুতরাং আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমি যখন মসজিদের দরোজার সামনে হাজির হই তখন আমি হযরতের ছাত্রদের কথাবার্তার শব্দ শ্রবণ করলাম। আমি মনে করলাম, এরাও বুঝি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসছেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। যখন লোকজনের কথাবার্তা কিছু কমে আসলো তখন মৃদু কাশি দিলাম যাতেকরে আমার উপস্থিতি সবার নিকট অনুভুত হয়।

শায়খ দরোজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে কে?" তিনি মসজিদে প্রবেশ হতে আমাকে ইশারা করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য মসজিদের ভেতর আর কেউ ছিলেন না! আমি সালাম কালাম শেষে জিজ্ঞেস করলাম, "হযরত! এইমাত্র শুনছিলাম আপনার সঙ্গে অনেক লোক কথাবার্তা করছে। এরা কোথায়

---

[৮৭] প্রাগুক্ত।

গেলেন?” তিনি বললেন, “আহ, তুমি শুনেছো বুঝি?” তিনি বুঝিয়ে বললেন, একদল জিন তাঁর দারসে যোগ দিয়েছিলেন। তারা তাঁরই ছাত্র।[৮৮]

আবিল জাদ্দ হিরানী রাহিমাহুল্লাহ

এক ব্যক্তি এসে হাজির হলো হযরত হিরানী রাহিমাহুল্লাহর দরবারে। তার উদ্দেশ্য ছিলো হযরতের কোনো কারামত দেখবে। বললো, “হুজুর! লোকে আপনার কারামত সম্পর্কে অনেক কিছু বলে। দয়া করে একটি কারামত দেখান। হযরত তখন জামে মসজিদে ছিলেন। তিনি নিজর পাদ্বয় লম্বা করলেন। দেখা গেলো মসজিদের জানালা পেরিয়ে যা দুটি একেবারে ফোরাত নদীতে গিয়ে ভিজে গেছে! এরপর নিজের পা মসজিদের ভেতর নিয়ে আসলেন। উভয় পা থেকে ফোটায় ফোটায় পানি ঝরছিলো।[৮৯]

মা’বুদ গনি সুফি ইয়ামনী রাহিমাহুল্লাহ

ইমাম ইয়াফি বর্ণনা করেন, যখনই মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মা’বুদ গনি সুফি ইয়ামনী রাহিমাহুল্লাহ কোনো মরুভূমির উপর দিয়ে হেঁটে যেতেন তখন আল্লাহর কুদরতে ঝরণার পানি বেরিয়ে আসতো। লোকজন ওসব এলাকায় পরবর্তীতে বসত করা শুরু করে। এভাবে কয়েকটি এলাকায় জনবসতি গড়ে ওঠে।[৯০]

---

[৮৮] জামি’ কারামাতুল আউলিয়া।

[৮৯] জামি’ কারামাতুল আউলিয়া।

[৯০] প্রাগুক্ত।

মুহাম্মদ শামসুদ্দিন হানাফী রাহিমাহুল্লাহ

মুহাম্মদ শামসুদ্দিন হানাফী রাহিমাহুল্লাহ সময় সময় কুরাফা নামক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাত্রা করতেন। স্বভাবতই তিনি কবরস্থানের মুর্দাদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, “আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরী”। কবরবাসীদের পক্ষ থেকে সালামের জবাবও আসতো, “ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া শায়খ!”।

তাঁর আরেকটি কারামত ছিলো এই: যখনই তিনি কোনো বন্য ঘোড়ার পিঠে হাত রাখতেন, তখনই সেটি গৃহপালিত ঘোড়ার মতো স্থির হয়ে যেতো। এরপর থেকে কখনো তার আরোহীদের কষ্ট দিতো না।[৯১]

আবদুর রহমান ওয়াক্বী রাহিমাহুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো মুহাদ্দ ইবনে আহমদ আবদুর রহমান ওয়াক্বী রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর একটি লেবুর গাছ ছিলো। প্রতি মৌসুমে এতে ১০০০ লেবু ধরতো। তিনি লেবুগুলো বিক্রি করে যা পেতেন তা দিয়ে পারিবারের খরচপাতি আঞ্জাম দিতেন।

এক রাতে একদল লোক লেবু গাছের নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তারা গছের ডাল ভেঙ্গে দিলেন। যখন তারা ফেরত যাচ্ছিলো তখন সবাই অন্ধ হয়ে গেলেন। তারা কোনদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন বুঝতেই পারছিলেন না। এদিকে শায়খ ওয়াক্বী তাদের নিকট আসলেন। তারা হযরতের নিকট মাফ চাইলো। হযরত মাফ করে দিলেন। তাদের সবার চক্ষু ভালো হয়ে গেলো। তারা এটাও প্রতিশ্রুতি দিলেন আর কোনোদিন লেবুর গাছের নিকটেও যাবেন না।[৯২]

---

[৯১] প্রাগুক্ত।

[৯২] জামি’ কারামাতুল আউলিয়া।

আবদুর রহমান সাক্বাফ রাহিমাহুল্লাহ

একদা এক মহিলা হযরত আবদুর রহমান সাক্বাফ রাহিমাহুল্লাহকে আমন্ত্রণ করলেন। হুজুর খুব অল্প খাবার খেলেন। এরপর বমি করে সবকিছু ফেলে দিলেন। তিনি খাবারের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এগুলো চুরির খাবার!”। মহিলা স্বীকার করলেন, তার স্বামীর কাছ থেকে চুরি করে টাকা এনে এই খাবার জোগাড় করেছেন।[৯৩]

মুহাম্মদ মৌলা দাওয়াইলা রাহিমাহুল্লাহ

হযরত দাওয়াইলা রাহিমাহুল্লাহর এক মেয়েসন্তান ছিলেন। কেনো একদিন মেয়েটি উটের পিঠ থেকে শক্ত মাটির ওপর পড়ে গেলেন। এ সময় মেয়ের পিতা দাওয়াইলাই রাহিমাহুল্লাহ শহরে ছিলেন। হযরতের সাথীরা লক্ষ করলো তিনি যেনো কিছু একটা ধরে নিলেন। তারা বললো, আপনি এরূপ করলেন কেনো? তিনি বললেন, আমার মেয়ে উলুবিয়া এইমাত্র একটি উটের পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। আমি তাকে ধরলাম, যাতে সে শক্ত মাটিতে পড়ে ভীষণ ব্যথা না পায়।

পরবর্তীতে জানা গেলো উলুবিয়া মাটিতে পড়লেও ব্যথা পান নি। মেয়েটি বললেন, “আমার হুঁশ ছিলো না। পড়ার সময় দেখলাম আমার পিতা আমাকে ধরে আস্তে আস্তে মাটির ওপর রাখলেন।”[৯৪]

ইউসুফ ইয়ামনী রাহিমাহুল্লাহ

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইউসুফ আশকাল ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বড় মাপের একজন ওলিআল্লাহ ছিলেন। সমসাময়িক ওলি আবু বকর ক্লাস বলেন, আমি একদিন হযরতকে আবদার জানালাম, আপনার একটি কারামত দেখতে

---

[৯৩] প্রাগুক্ত।

[৯৪] প্রাগুক্ত।

চাই। তিনি ডান হাতের দুটি অঙ্গুলি উঠালেন। প্রথমটির মাথার মধ্যে জ্বলন্ত অহগ্নশিখা দেখলাম আর দ্বিতীয়টির মাথা থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসছিল পানি। তিনি বললেন, “কী হে আবু বকর! কিছু দেখেছো?” জবাব দিলাম, “হ্যাঁ হুজুর, দেখেছি।” তিনি উভয় আঙ্গুল বন্ধ করলেন। যথাক্রমে আগুন ও পানি মিলিয়ে গেলো।[৯৫]

আবু ইসহাক্ব আজরী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত আবু ইসহাক্ব আজরী রাহিমাহুল্লাহর একটি কারামত ইব্রাহিম আল-আজরী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন এক ইয়াহুদি হযরত আবু ইসহাক্বের নিকট উপস্থিত হলো। সে কিছু টাকা চাইলো হযরতের নিকট। তিনি ইয়াহুদির বাঁশ ঝাড় থেকে কয়েকটি বাঁশ এনেছিলেন। একত্রে থাকাবস্থায় ইয়াহুদি বললো, “আপনার কিছু কারামত আমাকে দেখাবেন? এর দ্বারা আমার ইয়াহুদি ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য অবলোকন করতে পারবো। আমি আভিভুত হলে হয়তো আপনার ধর্মে দীক্ষিত হতেও পারি।” হযরত আবু ইসহাক্ব বললেন, “তুমি সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করে নেবে?” ইয়াহুদি বললো, “অবশ্যই”।

হযরত আবু ইসহাক্ব রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “আপনার পরনের জুব্বা খুলে দিন।” একথা বলে তিনি নিজের জুব্বাও খুললেন। ইয়াহুদির জুব্বা নিজেরটার ভেতর রেখে মুড়িয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে উভয়টি নিক্ষেপ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি উভয় জুব্বা বের করে নিয়ে আসলেন। দেখা গেলো বাইরের জুব্বা যা ছিলো হযরত আবু ইসহাকের তা সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে। অপরদিকে ভেতরে থাকা ইয়াহুদির জুব্বা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ আশ্চর্য কারামত দেখে ইয়াহুদি সত্যিই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলো।[৯৬]

---

[৯৫] প্রাগুক্ত।

[৯৬] জামি’ কারামাতুল আউলিয়া।

আবুল হুসাইন নূরী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত জাফর ইবনে জুবায়ের হাসিমী বলেন, আবুল হুসাইন নূরী রাহিমাহুল্লাহ একদিন গোসল করতে নদীতে গেলেন। এক চোর এসে তাঁর সকল কাপড় চুরি করে নিয়ে গেলো। এদিকে আবুল হুসাইন নদী থেকে উঠলেন না। এরপর দেখা গেলো তাঁর সকল কাপড়-চোপড় নিয়ে চোর ফেরৎ এসেছে নদীর তীরে। চোর বললো, আমার ডান হাত সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে। সে হযরতের নিকট মাফ চাইলো ও তার জন্য দু'আ করতে বললো। আবুল হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ দুআ করলেন: "হে আল্লাহ! সে তো কাপড় নিয়ে আমার নিকট ফিরে এসেছে। এবার তার হাতটি সুস্থ করে দিন।" আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ওলির প্রার্থনা কবুল করলেন। চোরের হাত ভালো হয়ে গেলো।[৯৭]

আবু জাফর কাত্তানী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত আবু আবদুল্লাহ ইবনে খালিফ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু জাফর কাত্তানীকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কতোবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন? তিনি জবাব দিলেন, "অনেক বার দেখেছি। আমি প্রশ্ন করলাম, '১০০০ বার?'। তিনি বললেন, 'না'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, '৯০০ বার?' তিনি বললেন, না'। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে ৮০০ বার?'। বললেন, 'এতোবার হবে না'। অবশেষে আমি বললাম, '৭০০ বার?'। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ পরিমাণ হবে।"

হযরত কাত্তানী রাহিমাহুল্লাহ প্রত্যেকদিন দুপুরের পূর্বে কুরআন শরীফ পাঠ করে শেষ করতেন। একদিন তিনি অযু করতে বাথরুমে গেলেন। পা পিছলে পড়ে গেলেন। সেদিন তাঁকে যুহরের নামাযের সময় কেউ দেখলো না। অনেকে তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হলো। পা পিছলে পড়ে গিয়ে তাঁর একটি পা ভেঙ্গে গিয়েছিলো। এ কারণে ঐ বছর তিনি মদীনা মুনুওয়ারায় যেতে পারেন নি। তিনি

[৯৭] হিলইয়াতুল আউলিয়া, হযরত আবু নুয়াইম ইসফাহানী রাহিমাহুল্লাহ।

একখানা পত্র লিখলেন। মদীনার যাত্রীদেরকে অনুরোধ জানালেন, "এই পত্রখানা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকের পাশে রেখে দেবেন।

কাত্তানী রাহিমাহুল্লাহর পত্রবাহক বন্ধু যথাস্থনে পত্রটি রাখলেন। এ রাতেই আবু জাফর রাহিমাহুল্লাহ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। হুজুর বললেন, "আমরা তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার অপারগতা জেনেছি। আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা কবুল করেছি।"[৯৮]

খাইরুন নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহ

হযরত খাইরুন নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসলে পরে তিনি কক্ষের এক কোণের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটু অপেক্ষা করো। তোমার নির্দেশ তুমি পালন করবে ঠিকই। আমারও একটি কাজ রয়ে গেছে।" তিনি অযুর জন্য পানি চাইলেন। অযু সেরে দু'রাকাআত নামায আদায় করে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করলেন। এরপর কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করে চলে গেলেন চিরতরে। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত দাইলামী বলেন, আমি দেখেছি তাঁর নিকট একজন মহিলা এসে রুমাল চাইলেন। তিনি রুমাল দিলেন। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'এটার দাম কতো?' তিনি বললেন, 'দুই দিরহাম'। মহিলা বললেন, 'এখন আমার নিকট ২ দিরহাম নেই। আমি আগামীকাল এসে এ টাকা পরিশোধ করবো।' হযরত বললেন, 'কাল এসে যদি আমাকে না পাও তাহলে ঐ দুই দিরহাম দজলা নদীতে ফেলে দেবে। আমি এগুলো সেখান থেকে সংগ্রহ করবো!' মহিলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কীভাবে নদীগর্ভ থেকে দিরহামগুলো তুলে আনবেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'এ ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই। শুধুমাত্র যা বলেছি তা-ই করো।'

---

[৯৮] প্রাগুক্ত।

পরদিন মহিলা ২ দিরহাম নিয়ে ঠিকই তাঁর দোকানে উপস্থিত হলো। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে কথামতো এক টুকরো কাপড়ে মুড়িয়ে দিরহাম দুটো দজলা নদীতে ফেলে দিলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে হযরত নাসসাজ রাহিমাহুল্লাহ এসে দোকান খুললেন। এরপর অযু সেরে নিতে নদীর ঘাটে গেলেন। এক ব্যক্তি কাপড়ে মুড়ানো ঐ দুই দিরহাম নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিলো। এরপর সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো।[৯৯]

সাঈদ জায়িদী রাহিমাহুল্লাহ

শায়খ আবু হাসান কাতি বলেন, সাঈদ জায়িদীর ইন্তিকালের আগের দিন তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে সুস্থ ছিলেন। তাঁর দেহে কোনো ধরনের রোগের নামগন্ধও ছিলো না। তিনি মানুষের সামনে চলে এসে বলতে থাকেন, “আমি তোমাদের নিকট থেকে বিদায় নিতে এসেছি। শীঘ্রই আমি একটি ভ্রমণে যাবো।” এরপর খুব ব্যস্ততার মধ্যে দিনটি কাটালেন। তিনি সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কেউই বুঝতে পারলো না, ‘ভ্রমণ’ দ্বারা তিনি শেষ ভ্রমণ তথা মৃত্যু বুঝাচ্ছিলেন।

সত্যিই পরের দিন তিনি ইন্তিকাল করলেন। আর এ সংবাদ শুনার পর লোকজন বুঝতে সক্ষম হলো তিনি কোন ভ্রমণে যাওয়ার জন্য সবাইকে বলছিলেন।[১০০]

জামালুদ্দিন বারলাসী রাহিমাহুল্লাহ

এই বিখ্যাত কারামতওয়ালা ওলি সম্পর্কে যুগের সবাই অবগত ছিলো। তিনি প্রায়ই সিংহের পিঠে আরোহণ করতেন। পাখিদের ডাক দিলে সবগুলো তার কাছে চলে আসতো। এছাড়া নদীর পারে যেয়ে মাছগুলোকে ডাক দিতেন। অনেক মাছ

---

[৯৯] প্রাগুক্ত।

[১০০] জামে’ কারামাতুল আউলিয়া।

তার সম্মুখে এসে হাজির হতো। তিনি যেগুলো খেতে চাইতেন সেগুলো নিয়ে যেতেন।[১০১]

জুমুআতুল হামুরী রাহিমাহাল্লাহ

জুমুআতুল হামুরী রাহিমাহুল্লাহ তখন বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করেছেন। একদিন তিনি মিনারে উঠে আযান দিয়ে নেমে আসলেন। মসজিদের নিকটে এক খ্রিস্টানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটলো। খ্রিস্টান প্রশ্ন করলো, "তোমাদের মসজিদগুলোর এই অবস্থা কেনো? আমাদের চার্চগুলো দীর্ঘদিন অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ তোমাদের মসজিদগুলো কিছুদিন পরেই বুড়ো ও নড়বড়ে হয়ে পড়ে?" শায়খ হামুরী জবাবে বললেন, "যখনই আমাদের কেউ 'আল্লাহু আকবার!' ধ্বনি তুলে তখন আশপাশের পাহাড়গুলোও কেঁপে ওঠে।" একথা শুনে খ্রিস্টান ভীষণভাবে ভয় পেলো। মাত্র তিনদিন পর সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো।[১০২]

হুসাইন আল মাজযূলা রাহিমাহুল্লাহ

হযরত মাজযূলা রাহিমাহুল্লাহ যখনই পিপাসার্ত হতেন তখনই চলে যেতেন কূপের নিকট এবং বলতেন, "হে কূপ! হুসাইন পিপাসার্ত"। দেখা যেতো কূপের পানি উপরে উঠে হযরতের মুখ বারবর ভরে গেছে। তিনি ভালোকরে পানি পান করার পর পানির স্তর আগের অবস্থায় নেমে যেতো।[১০৩]

---

[১০১] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

[১০২] প্রাগুক্ত।

[১০৩] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী রাহিমাহুল্লাহ

জুমুআ নামাযের পূর্বে একব্যক্তি হযরত তুসতারী রাহিমাহুল্লাহর নিকট আসলো। শায়খের কক্ষে ঢুকে এক বিরাট আকারের সাপ তার চোখে পড়লো। ভয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। হযরত তুসতারী বললেন, "প্রবেশ করো! সত্যিকার ঈমানদার আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছু ভয় করতে পারে না।" এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "জুমুআর নামায কোথায় পড়বে?" লোকটি জবাব দিলো, "এখান থেকে মসজিদের দূরত্ব একদিনের ভ্রমণপথ!" শায়খ লোকটির হাতে ধরে চোখ বুজলেন। এরপর চোখ খুললেন- তাঁরা উভয়ে সেই দূরবর্তী মসজিদে এসে হাজির হয়ে গেলেন। নামায শেষে মুসল্লিরা বের হয়ে যাওয়ার সময় হযরত তুসতারী রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করলেন, "এরা সবাই পাঠ করে- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কিন্তু খুব অল্প জনই এ ব্যাপারে আন্তরিক।"[১০৪]

আবু মুহাম্মদ তালহা ইয়ামনী রাহিমাহুল্লাহ

এটা সবার জানা ছিলো যে, শায়খ ইয়ামনী সজাগ অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। একদল লোক এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো। তারা কাজী সাহেবের সাথেও কথা বলেছে। অবশেষে তারা একমত হলো যে, শায়খ ইয়ামনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তারা যখন শায়খের হুজরায় প্রবেশ করলো তখন শায়খ একে একে সবার নাম বলে দিলেন। এরপর বললেন, "আপনারা এখনও বিশ্বাস করছেন না, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সজাগ অবস্থায় দেখেছি।" লোকজন একথা শুনে অবাক হলো কারণ, তাদের কাউকে তিনি চিনতেন না। তারা কিসের জন্য সাক্ষাতে এসেছে তা-ও তিনি জানতেন না। অথচ তিনি সবকিছু বলে দিচ্ছেন। সবাই সামনে এগিয়ে শায়খের কপালে চুমো খেলো। হযরতের নিকট মাফ চাইলো। এরপর চলে গেলো।

---

[১০৪] প্রাগুক্ত।

অন্য বর্ণনায় আছে, কাজী সাহেব বলেন, "প্রবেশ করার পর আমরা কিছুক্ষণ শায়খের কক্ষে বসে থাকি। এরপর বের হয়ে আসি। একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, "আপনারা তাঁকে কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি?" আমি বললাম, আল্লাহর কসম! সেখানে থাকাবস্থায় আমি দেখলাম হযরত ইয়ামনীর পাশেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন!"[১০৫]

আবদুর রাহমান ইয়ামনী রাহিমাহুল্লাহ

তাঁর পূর্ণ নাম ছিলো আবু ফারজ আবদুর রাহমান ইবনে আবিল খায়র ইবনে জুবায়ের ইয়ামনী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি যুগের এক বিখ্যাত ওলিআল্লাহ ছিলেন। একদা শায়খ আহমদ ইবনে জা'দ হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতে গেলেন। তিনি শায়খ ইয়ামনীকে বললেন, "এখন আপনার সর্বোচ্চ মাক্বামে ভ্রমণের সময় এসছে।" তিনি বলতে চেয়েছেন, মহান প্রভুর দরবারে চলে যাওয়ার সময় এসছে। কী আশ্চর্য! একথা শ্রবণ করার পরই শায়খ ইয়মনী ইন্তিকাল করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।[১০৬]

আবদুল আজিজ ইবনে সালমান রাহিমাহুল্লাহ

বর্ণিত আছে, যখনই হযরত আবদুল আজিজ ইবনে সালমান দু'আ করতেন তখন জিনরা এসে দু'আয় শরিক হতো।[১০৭]

---

[১০৫] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

[১০৬] প্রাগুক্ত।

[১০৭] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

ইয়াহইয়া ইবনে সালমান রাহিমাহুল্লাহ

কোনো একদিন হযরত সালমান রাহিমাহুল্লাহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক নারীর চিৎকার শুনলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী হয়েছে?" মহিলা বললেন, "আমার সন্তান কূপে পড়ে গেছে।" শায়খ সালমান কূপের ভেতর হাত ঢুকালেন। সাথে সাথে কূপের পানি উপরে উঠে আসলো। সন্তানটিও ভেসে আসলো উপরে। তিনি তাকে উদ্ধার করলেন। ক্রন্দনরত মহিলার কোলে তার সন্তান ফিরে আসায় বার বার হযরতের প্রতি মহিলা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[১০৮]

হযরত জুন নূরাইন রাহিমাহুল্লাহ

একজন সুফি বর্ণনা করেন, আমি জুন নূরাইন রাহিমাহুল্লাহকে দেখেছি। একদিন দু'ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাতে আসলো। এদের একজন ছিলো সৈনিক আর অপরজন সাধারণ ব্যক্তি। উভয়ে কথা কাটাকাটি করে শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি-মারামারি করেছে। ফলে সৈনিকের এতটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। সৈনিক সাধারণ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো বাদশাহের দরবারে। সে বিচার চায়।

রাস্তায় কিছুলোক সৈনিককে উপদেশ দিলো, ঐ বাড়িতে হযরত জুন নূরাইন রাহিমাহুল্লাহ আছে। তুমি ওখানে গেলে উচিৎ বিচার পাবে। জুন নূরাইন রাহিমাহুল্লাহর সামনে আসতেই প্রথমে সৈনিকের দাঁতে মুখের থুথু লাগিয়ে বললেন, "নাও, তোমার দাঁত স্বস্থানে বসাও।" আশ্চর্যের ব্যাপার, দাঁত আগের মতোই বসে গেলো। সুতরাং সৈনিক সন্তুষ্ট হলো এবং সাধারণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ তুলে নিলো।[১০৯]

---

[১০৮] প্রাগুক্ত।

[১০৯] রওজাতুর রায়াহীন।

হযরত ইবনে আজীল রাহিমাহুল্লাহ

হযরত মুআ’লিফ বলেন, এক ইয়ামনী ব্যক্তির হাতে টিউমারের মতো কী একটা ছিলো। লোকটি সকল সুফিদের নিকট দু’আ চাইলো যাতে এটি মিলিয়ে যায়। কিন্তু কোনো কাজে আসলো না। টিউমার রয়ে গেলো।

অবশেষে লোকটি চলে আসলো হযরত ইবনে আজীল রাহিমাহুল্লাহর নিকট। সে বললো, “ইয়া শায়খ! আপনিও যদি আমাকে আরোগ্য হতে সহায়ক না হোন তাহলে সুফিদের প্রতি আমার সব আস্তা উটে যাবে।” ইবনে আজীল রাহিমাহুল্লাহ একথা শুনে বললেন, “লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাবিল আলিয়্যিল আজীম।” তিনি লোকটির হাতে ব্যান্ডেজ দিতে দিতে বললেন, “তুমি ফিরে যাও এবং নিজের গৃহে প্রবেশ করে ব্যান্ডেজ খুলে দিও।” লোকটি বিদায় হয়ে গেলো।

বাড়ি যাওয়ার পথে এক জায়গায় থেমে কিছু রুটি ও দুধ পান করার সময় ঐ লোকটি লক্ষ করলো তার হাতের ব্যান্ডিজ নেই। এছাড়া টিউমারটিও নেই। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আজীল রাহিমাহুল্লাহর দরবারে ছুটে এসে সে বার বার ধন্যবাদ দিতে থাকে।[১১০]

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী রাহিমাহুল্লাহ

বিখ্যাত ওলিআল্লাহ হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটলো তাঁর বাসস্থানের নিকট। সবাই তাঁর জানাযায় শরীক হতে চায়। একই শহরে ৭০ বছর বয়স্ক এক ইয়াহুদী বাস করতেন। তিনি মানুষের কোলাহল দেখে নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসলেন। তিনি যখন জানাযার লোকজনদের দেখলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, “আমি যা দেখছি তোমরা সবাই কী তা দেখছো?” কিছু লোক প্রশ্ন করলো, “আপনি কী

[১১০] প্রাগুক্ত।

দেখছেন?” তিনি বললেন, “আমি এক বিরাট সৈন্যদলকে দেখছি যারা আকাশ থেকে অবতরণ করছেন। তারাও তুসতারীর জানাযায় শরীক হবে।”[১১১]

আলী ইবনে বাক্কার শামী রাহিমাহুল্লাহ

আলী ইবনে বাক্কার শামী রাহিমাহুল্লাহ তখন জিহাদে অংশগ্রহণ করছিলেন। জিহাদে মুসলমানদের পরাজয় হয়। সুতরাং তিনিও পরাজিত হলেন। তাঁর ঘোড়াটি আহত হয়। এ বিপর্যয় ক্ষণে তিনি সজোরে পাঠ করলেন, “ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।” আশ্চর্য, তাঁর ঘোড়াও বললো, ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন।[১১২]

আদি ইবনে মুসাফির রাহিমাহুল্লাহ

আদি ইবনে মুসাফির রাহিমাহুল্লাহ বাগদাদের অধিবাসী এক বড় মাফের ওলিআল্লাহ ছিলেন। হযরত সিরাজ বর্ণনা করেন, শায়খ আবু ইসরাইল আমাকে বলেছেন, একদিন আবি ইবনে মুসাফিরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমি আবাদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ইবনে মুসাফির আমাকে উপদেশ দিলেন, যখনই তুমি কোনো হিংস্র জন্তুর সামনে পড়বে তখন বলবে, ‘আদি ইবনে মুসাফির তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এখান থেকে চলে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও’। বাস্তবে আবু ইসরাইল সত্যিই এক হিংস্র জানোয়ার তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যোত হয়। তিনি হযরত আদি ইবনে মুসাফির রাহিমাহুল্লাহর কথা মতো জন্তুকে নির্দেশ দিলেন চলে যেতে। সাথে সাথে জন্তুটি তার মাথা নিচু করে চলে গেলো।[১১৩]

---

[১১১] জামি’ কারামাতুল আউলিয়া।

[১১২] প্রাগুক্ত।

[১১৩] জামি’ কারামাতুল আউলিয়া।

আবদুল আজিজ ইবনে ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ

একদিন হযরত আবদুল আজিজ ইবনে ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ নিজের আবা খুলে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। এক চোর এসে হযরতের আবাটি হাতে নিয়ে বের হতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। মসজিদের দরোজা বন্ধ হয়ে গেছে। সে তাঁর আবা মেঝের ওপর রেখে দিলা। সাথে সাথে দরোজাও খুলে গেলো। চোর কয়েকবার এভাবে চেষ্টা চালালো। আবা হাতে থাকলে দরোজা বন্ধ- না হয় খোলা। অবশেষে শায়খ তাকে প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে?" চোর সব কথা খুলে বললো। শায়খ বললেন, "আবা রেখে চলে যাও। এই আবার মালিক এটি পরনে রেখে অনেকদিন তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন। এ আবা কী করে তার মালিককে ফেলে অন্যত্র যেতে পারে?[১১৪]

আবদুর রহমান ইবনে উস্তাজ আজম রাহিমাহুল্লাহ

শায়খ আবদুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ কয়েকজন সাথীসহ হযরত হূদ আলাইহিসসালামের কবর জিয়ারতে গেলেন। হযরতের কয়েকজন সাথী কিছু খাবার তাঁর সামনে এনে দিলেন। তিনি খেলেন না। তারা বললেন, "এ খাবার হালাল- বিশেষভাবে আপনার জন্য তৈরি করা হয়েছে।" তিনি একটি সবুজ পাখির দিকে ইশারা করে বললেন, "এই সবুজ পাখি আমাকে বলেছে, এ খাবার সন্দেহযুক্ত। হয়তো বা এটি হালাল নয়।" এরপর সত্যিই জানা গেলো খাবারটি সন্দেহযুক্ত।[১১৫]

---

[১১৪] প্রাগুক্ত।

[১১৫] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

তাইয়্যিব ইবনে ইসমাঈল জাহলী রাহিমাহুল্লাহ

হযরত ইবনে ইসামাঈল জাহলী অন্ধ ছিলেন। তাঁর একজন খাদিম তাঁকে সমজিদ পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। একদিন তিনি শায়খকে বললেন, "হে শায়খ! আপনার জুতো খুলুন।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেনো?" জবাব আসলো, "এতে নাপাকি লেগে আছে।" একথা শুনে তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হলেন। হাত তুলে কেঁদে কেঁদে দু'আ করলেন। আল্লাহর কী কুদরত! সাথে সাথে তাঁর চোখ দুটো ভালো হয়ে গেলো। তিনি আর অন্ধ রইলেন না।[১১৬]

একজন ইয়ামনী সুফি ও তাঁর গাধা

আবি সাবরাতা নাখই বলেন, ইয়ামন থেকে এক সুফি-দরবেশ ভ্রমণে ছিলেন। অর্ধপথে এসে তাঁর গাধাটি মারা গেলো। সুফি সেখানে দাঁড়িয়ে ২ রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর খুব আকুতি-মিনতি করে দুআ করলেন: "ওহ আল্লাহ! আমি তোমার রাস্তায় বের হয়েছি। একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য এ মুজাহিদ অনুসন্ধানে আছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই মহাশক্তিধর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা যিনি জীবন দান করতে সক্ষম। তুমি সক্ষম মৃতকে কবর থেকে জীবিত করতে এবং জীবিতকে মৃত করতে। আমি তোমার নিকট আবেদন জানাচ্ছি আমার গাধাকে জীবিত করে দাও।" আল্লাহর কী কুদরত! মৃত গাধাটি লাফ মেরে উঠে গেলো।[১১৭]

হযরত ফযল ইবনে আহমাদ মুহীনী রাহিমাহুল্লাহ

একদা এক বণিক তাঁর কাফেলার সাথীদের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। তিনি সাক্ষাৎ পেলেন হযরত ফযল ইবনে আহমদ মুহীনী রাহিমাহুল্লার সাথে। শায়খ বণিকের অবস্থা জানতে চাইলেন। বণিক তার কাফেলাকে হারিয়ে ফেলার ব্যাপারটি

---

[১১৬] প্রাগুক্ত।

[১১৭] প্রাগুক্ত।

হযরতকে অবগত করলেন। এ সময় কোত্থেকে একটি সিংহ তাদের নিকটে হাজির হলো। শায়খ ফযল রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “হে বণিক! এই সিংহের পিঠে আরোহণ করো।” তিনি সিংহকে বললেন, “এই বণিককে তার কাফেলার নিকট দিয়ে এসো।” বণিক সাহস করে সিংহের উপর আরোহণ করলেন। সিংহ তাকে নিয়ে সত্যিই তার কাফেলার নিকট পৌঁছুয়ে গেলো।[১১৮]

আমির মিহদার রাহিমাহুল্লাহ

বর্ণিত আছে যে, হযরত আমির মিহদার রাহিমাহুল্লাহ একদা হজ্জের ভ্রমণে মক্কা মুকাররমায় গেলেন। তিনি সেখানে দীর্ঘ চল্লিশ দিন ছিলেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি কিছুই খেলেন না। এমনকি এক ফোটা পানিও না। এ অবস্থায় থেকেও তিনি দুর্বল হলেন না। তিনি সবার মতো স্বাভাবিকভাবেই তাওয়াফ সাঈ ইত্যাদি করলেন। এমনকি প্রত্যেক দমে ১০০০ বার আল্লাহু লাতীফু ও আল্লাহু হাফিযু পাঠ করলেন প্রতিদিন।

হযরত আমির মিহদার রাহিমাহুল্লাহ কারো প্রতি রাগান্বিত হলে সে লোকটি পীড়াগ্রস্থ হতো। তিনদিন পর সে আরোগ্য লাভ করতো। একব্যক্তি এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করলো, “আপনি কী আল্লাহকে ভয় করেন না?” তিনি বললেন, “দেখুন, আমার কারোর প্রতি কোনো দুশমনি নেই। তবে আমার রাগ পেলে পেটের ভেতর আগুন জ্বলতে থাকে। যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি তাওবাহ কিংবা অসুস্থ না হয়েছে ততক্ষণ এ আগুন জ্বলতে থাকে।[১১৯]

---

[১১৮] প্রাগুক্ত।

[১১৯] জামি' কারামাতুল আউলিয়া।

শায়খ আলী আমরী রাহিমাহুল্লাহ

শায়খ আলী আমরী রাহিমাহুল্লাহ লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু এরপরও কোনো সময় কিছু লেখার প্রয়োজন পড়লে আরবীসহ অনেক ভাষায় তিনি লিখতে পারতেন। এটা ছিলো তাঁর এক বিশেষ কারামত।

আরো এক আশ্চর্য ব্যাপার ছিলো, তাঁর নিকট বছরের যে কোনো সময় অনেক ধরনের ফল থাকতো। অন্যকথায় গ্রীষ্মের ফল তাঁর কাছে শীতের সময় পাওয়া যেতো আর শীতের ফল পাওয়া যেতো গ্রীষ্মকালে।

হযরতের এক সাথী মাহমুদ আলকা বলেন, আমি একদা সমুদ্র সৈতকে তাঁর সাথে ছিলাম। এক সময় আমার খুব পিপাসা লাগলো। হযরত ব্যাপারটা টের পেয়ে অঞ্জলিতে সাগরের লবণাক্ত পানি তুলে নিয়ে আমাকে বললেন, এটা পান করো। আমি তৃপ্তিসহ পান করলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার পানি ছিলো সুস্বাদু মিষ্টি- লবণের কোনো নাম-গন্ধ নেই।[১২০]

---

[১২০] জামি' কারামাতুল আউলিয়ায়।